ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

পঞ্চম বর্ষ ● সংখ্যা: ১৫
জুলাই- সেপ্টেম্বর-২০২১

হজ্ব কুরবানী: নেপথ্য কথন

করোনাকালে শ্রমজীবী মানুষ এবং ঈদ উৎসব

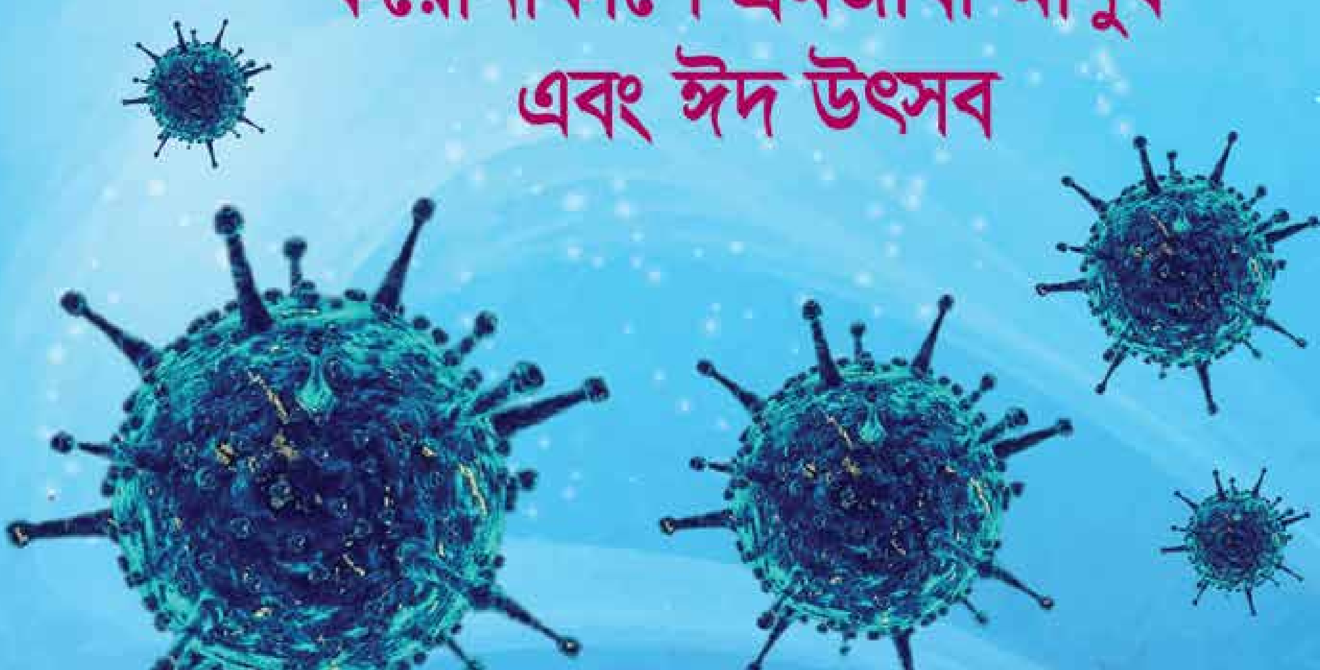

- শ্রমিক সংগঠন পরিচালনা ও গতিশীলতা আনয়নে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা
- হামাস: মুক্তিকামী মানুষের সাহসী ঠিকানা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আর নয় ভাড়ায় বাড়ী
ভাড়ার টাকায় নিজের বাড়ী
কিনলে চল **কর্ণফুলী** ।

আমাদের প্রতিষ্ঠান সমূহঃ

- কর্ণফুলী ডেভেলপারস্ (প্রা:) লি:
- কর্ণফুলী হাউজিং
- কর্ণফুলী গ্রীণ টাউন লি:
- কর্ণফুলী ফুড প্রোডাক্টস লি:
- এম.রহমান বিল্ডার্স

ফ্ল্যাট সাইজ

এ : ১৪০০ বর্গফুট
বি : ১৪০০ বর্গফুট
সি : ১৪০০ বর্গফুট
ডি : ১৪০০ বর্গফুট

কর্ণফুলী সাউথ ভিউ টাওয়ার
টমছমব্রীজ,কুমিল্লা

কর্ণফুলী গ্রুপ লিমিটেড

সম্পূর্ণ তৈরী প্লট, ফ্ল্যাট, বাড়ী এককালীন ও কিস্তিতে বিক্রয় চলছে

(ইসলামী শরিয়াহ্ মোতাবেক পরিচালিত)

টমছমব্রীজ, কুমিল্লা। মোবাইল : ০১৭১১-১১৮২৯৮, ০১৯৪১-৮৫৬২৬১
e-mail: karnafuly_housing@yahoo.com, Web: www.karnafulygroup.com

ত্রৈ-মাসিক
শ্রমিকবার্তা

পঞ্চম বর্ষ ● সংখ্যাঃ ১৫
জুলাই- সেপ্টেম্বর-২০২১

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আ.ন.ম শামসুল ইসলাম

সম্পাদক
আতিকুর রহমান

নির্বাহী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

সম্পাদনা সহযোগী
নুরুল আমিন
আজহারুল ইসলাম
আবুল হাসেম

সার্কুলেশন
আশরাফুল আলম ইকবাল

কম্পিউটার কম্পোজ
আহমাদ সালমান

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল
জুলাই-২০২১

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
www.sramikkalyan.org
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা

সূচিপত্র

- দারসুল কোরআন — ০৩
  মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আদিল
- করোনাকালে শ্রমজীবী মানুষ এবং ঈদ উৎসব — ০৮
  ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ
- শ্রমিক সংগঠন পরিচালনা ও গতিশীলতা আনয়নে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা — ১২
  আতিকুর রহমান
- শাহ আব্দুল হান্নান চাচা অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু স্মৃতি ও কিছু কথা — ১৬
  আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ
- হজ্ব কুরবানীঃ নেপথ্য কথন — ১৯
  মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম
- আশুরার চেতনা ও আমরা — ২৪
  হাফেজ মাওলানা নূর হোসাইন
- একজন পরিচচ্ছন্নতা কর্মী ও আমাদের সমাজ ব্যবস্থা — ২৭
  অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন
- হামাসঃ মুক্তিকামী মানুষের সাহসী ঠিকানা — ৩০
  হাফিজুর রহমান
- সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে চাতাল শ্রমিকের ভূমিকাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ — ৩৩
  ড. মোঃ জিয়াউল হক
- শ্রম আইনে ছুটির নীতিমালা — ৩৭
  অ্যাডভোকেট জাকির হেসেন
- বাংলাদেশে কর্ম পরিবেশ এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের প্রভাব — ৪০
  ফাহিম ফয়সাল
- চা শ্রমিকের জীবন-যাপন — ৪৩
  আব্দুল্লাহ আল মামুন
- সংগঠন সংবাদ — ৪৬

সম্পাদকীয়

বিশ্ব করোনা পরিস্থিতিতে সমাজের কিছু মানুষ যখন করোনার ঝুঁকি থেকে নিজেকে এবং তার পরিবারকে বাঁচাতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করছেন, ঠিক তখনি সমাজের কিছু মানুষ নিজেকে ও তার পরিবারকে ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে বাচাঁবার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজে বের হচ্ছেন। কেউ ভালো থাকার জন্য অন্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছেন আবার কেউ অন্যকে ভালো রাখতে নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছেন। এভাবেই মহামারিতে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে আমাদের দেশের শ্রমিকরা জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। আর এমন পরিস্থিতিই বলে দিচ্ছে একজন শ্রমিকের কাছে জীবনের চেয়ে জীবিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। জীবন যেখানে জীবিকার কাছে তুচ্ছ বাস্তবতা সেখানে আরো নির্মম! এত কিছুর পরও শ্রমিক তার জীবিকা নিয়ে অজানা আতঙ্কের মধ্যে সময় পার করে, এই বুঝি ছাঁটাইয়ের নোটিশ চলে এলো।

স্বাভাবিক সময়েই দেশে বড় সমস্যা ছিলো কর্মসংস্থানের। এরপর কয়েকদফা করোনার আঘাতে বিপর্যস্ত দেশের শ্রমবাজার। লকডাউনের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৩৫ শতাংশ শ্রমিকের আয় কমেছে। তাদের কেউ কাজ হারিয়েছে, কারো কাজের কর্মঘন্টা কমেছে, কারো মজুরী কমেছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষনা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) ও সুইডেনের ওয়েজ ইন্ডিকেটর ফাউন্ডেশন (ডব্লিউআইএফ) দেশের চারটি খাতের শ্রমিকদের নিয়ে একটি জরিপ করেছে। তাদের জরিপ অনুযায়ী তৈরী পোশাক, চামড়া, নির্মাণ ও চা এই চার খাতের শ্রমিকদের ৮০ শতাংশ অর্থাৎ প্রতি ১০০ জনে ৮০জন শ্রমিকের মজুরী কমেছে। আরেক পরিসংখ্যানে জানা যায়, দেশে ৫০ শতাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের ৭৬ থেকে শতভাগ শ্রমিককে লে-অফ দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে ৩৭ শতাংশ শ্রমিকের আয় কমেছে। আর বেসরকারী গবেষনা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসেপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (বিআইজিডি) এক যৌথ সমীক্ষায় বলা হয়েছে, করোনার কারণে নতুন করে দরিদ্র হয়েছে আড়াই কোটি মানুষ। সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) তথ্যানুসারে করোনায় ২ কোটি ৬৪ লাখ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে এসেছে। এদের অধিকাংশ শ্রমজীবী। গৃহ শ্রমিকদের ৮০ শতাংশ কাজ হারিয়েছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো তার হিসাবে জানিয়েছিল, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পূর্ববর্তী বছরের ২১ দশমিক ৮ শতাংশের তুলনায় দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে হয়েছিল ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। পরিসংখ্যান ব্যুরো তার হিসাবে আরো জানিয়েছিল, দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৩ লাখের মধ্যে গত বছর মোট গরীব ছিল ৩ কোটি ৪১ লাখ ৩ হাজার ২৫০ জন বা ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। করোনার কারণে গত বছর গরীবের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ কোটি ৮৯ লাখ ১ হাজার ৮৫০ জনে। এই হিসাবে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ১ কোটি ৪৮ লাখ ১ হাজার ৮৫০ জন। উল্লেখ্য, ব্র্যাক এবং বিআইডিএসসহ অন্য কয়েকটি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাবের সঙ্গে একমত হতে পারেনি। যেমন বিআইডিএস জানিয়েছিল, করোনার কারণে দেশে দরিদ্র মানুষের হার বেড়েছে ৩০ শতাংশের বেশি। আর ব্র্যাক মনে করে, এই হার প্রায় ৩৯ শতাংশ। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং-এর পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে, দরিদ্রের হার বেড়েছে ৪০ দশমিক ৫ শতাংশ। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, শতকরা হিসাবে পার্থক্য থাকলেও সকল সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানই স্বীকার করেছে, করোনার কারণে বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। করোনার প্রভাবে সমগ্র বিশ্বকেই বর্তমানে মহাসংকট পার করতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র হিসাবে বিশ্বের ৫০ শতাংশ মানুষ একই সংকটের শিকার হয়ে চাকরি তথা জীবিকা হারাতে পারে। বাংলাদেশেও চাকরি হারিয়ে বেকার হতে পারে কয়েক কোটি মানুষ। যার প্রভাব পরবে দেশের অর্থনীতি ও সমাজের উপর। এজন্য সরকারের উচিত নতুন করে যেন আর কাউকে বেকার না হতে হয় এবং সকল পেশার মানুষের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা হতে পারে সকলের সমন্বয়ে সেই চেষ্টা করা। আমরা আশা করি, সরকার সচেষ্ট হতে বিলম্ব করবে না এবং বাংলাদেশ করোনার মহাসংকটের পাশাপাশি দারিদ্রের হারও কমিয়ে আনতে সক্ষম হবে।

চারিদিকে শত সংকট তবুও মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। সময়ের ব্যবধানে বছর পরিক্রমায় সৃষ্টিকর্তার অনুপম নিদর্শন পবিত্র ঈদুল আযহা দরজায় কড়া নাড়ছে। করোনার এমন দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে এবারও উদযাপিত হতে যাচ্ছে কুরবানীর ঈদ তথা 'ঈদুল আযহা'। ইব্রাহিম (আ:) তার প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গের মাধ্যমে অনুপম, অনুকরনীয় নিদর্শন রেখে গেছেন। সেই আদর্শকে সামনে নিয়েই ত্যাগের মহিমায় মালিক-শ্রমিক ঈদ আনন্দ ভাগাভাগি করে নিবে সেই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করছি।

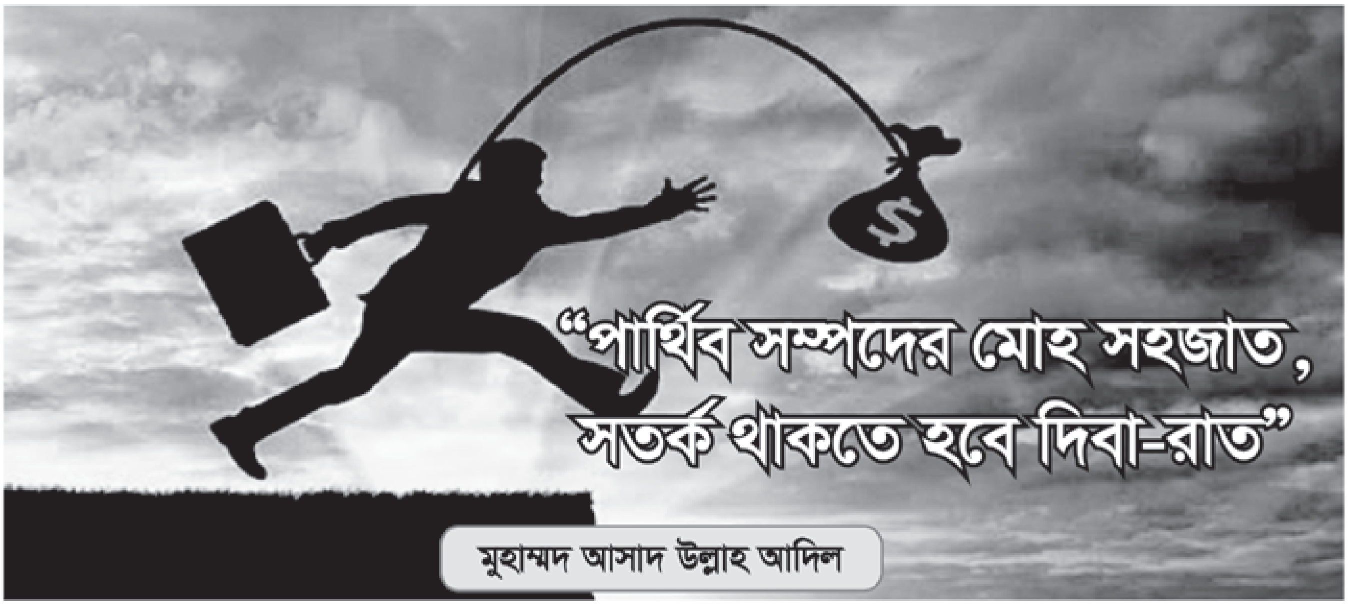

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَ الْبَنِيْنَ وَ الْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْاَنْعَامِ وَ الْحَرْثِ ؕ ذٰلِکَ
مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ - (সূরা আলে ইমরান : ১৪)

বাংলা অনুবাদ ঃ

➢ নারী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তুপ, বাছাইকৃত ঘোড়া, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে। এসব (কেবলমাত্র) পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম প্রত্যাবর্তনস্থল ।

নামকরণ ঃ অত্র সূরার ৩৩ নং আয়াত اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰۤى اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَ اٰلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ এর اٰلَ عِمْرٰنَ শব্দকে সূরার নাম হিসেবে চয়ন করা হয়েছে। এ সূরার অন্যান্য নাম আজ্ জাহরাহ (الزهرة) , আত্ তাইবাহ(التائبة) , আল্ কানুয (الكنوز) , আল্ আমান (الامان) , আল্ মুজাদালাহ (المجادلة) , আল্ ইসতিগফার (الاستغفار), আল্ মানিয়া(المانعة) ইত্যাদি।

নাযিলের সময়কাল ঃ এটি একটি মাদানী সূরা। পুরো সূরাটি চার ভাষণে নাযিল হয়ঃ

১ম ভাষণ ঃ ১ম রুকু থেকে ৪র্থ রুকুর ২য় আয়াত পর্যন্ত বদর যুদ্ধের পরে নিকটবর্তী সময়ে নাযিল হয়।

২য় ভাষণঃ ৪র্থ রুকুর ৩য় আয়াত থেকে ৬ষ্ঠ রুকু পর্যন্ত ৯ম হিজরীতে নাজরানের প্রতিনিধি দলের আগমনকালে নাযিল হয়।

৩য় ভাষণ ঃ ৭ম রুকু থেকে দ্বাদশ রুকু পর্যন্ত বদর ও উহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে নাযিল হয়। অর্থাৎ প্রথম ভাষণের সাথে সাথেই নাযিল হয়।

৪র্থ ভাষণঃ এয়োদশ রুকু থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত উহুদ যুদ্ধের পরে পর্যালোচনামূলক ভাষণ হিসেবে নাযিল হয়।

সম্বোধনঃ এ সূরায় বিশেষ করে দুটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে: এক: আহলে কিতাব (ইহুদী ও খ্রীষ্টান), দুই: এমন সব লোক যারা মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রতি ঈমান এনেছিল। প্রথম দলের আকীদাগত ভ্রষ্টতা ও চারিত্রিক দুষ্কৃতি সম্পর্কে সতর্কীকরণের পাশাপাশি দ্বিতীয় দলের শ্রেষ্ঠতম দলের মর্যাদা লাভ করার কারণ ও সত্যের পতাকাবাহী এবং বিশ্বমানবতার সংস্কার ও সংশোধনের দায়িত্ব অর্পণের বর্ণনা বিবৃত হয়েছে।

আলোচ্য বিষয় ও উপলক্ষ ঃ সামগ্রিক সূরায় ৪টি উপলক্ষ্য পরিলক্ষিত হয়ঃ

১. বদর যুদ্ধ পরবর্তী দুঃসময়
২. ইহুদীদের ষড়যন্ত্র
৩. মুনাফিকদের আত্মপ্রকাশ
৪. উহুদ যুদ্ধের পর্যালোচনা।

শানে নুযুল ঃ

বর্ণিত আছে যে, যখন নাজরান প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বিতর্ক করার লক্ষ্যে মদিনার দিকে রওয়ানা দিলেন, তখন আবুল হারেছা ও তার বড় ভাই কুরজ খচ্চরের পিঠে ছিল। খচ্চর হোঁচট খেলে বড় ভাই বলে উঠল 'মুহাম্মদ ধ্বংস হোক' (নাউযুবিল্লাহ)। আবুল হারেছা বলল, 'তোমরা ধ্বংস হও'। কুরজ এতে বিব্রত হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আবুল হারেছা বলল, 'ইনি সে নবী, যার আগমন বার্তা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে দেয়া হয়েছে'। কুরজ জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তুমি তার ওপর ঈমান আনছ না কেন'? সে উত্তরে বলল, 'রোমান সম্রাট আমাকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়ে রেখেছেন, তিনি আমাকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন। আমি যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর ঈমান আনয়ন করি তবে আমার সব সুযোগ-সুবিধা ছিনিয়ে নিবেন, ফলে আমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ব'। উল্লিখিত আয়াত আবুল হারেছার সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদে অবতীর্ণ হয় এবং দুনিয়ার এ সমস্ত বস্তু পরকালীন সম্পদের তুলনায় তুচ্ছ বলে ঘোষণা করা হয়।

আয়াতের তাফসীর ঃ অত্র আয়াতে ছয়টি বিষয়ের প্রতি মানুষের স্বভাবগত আকর্ষণের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়গুলো একদিকে যেমন লোভনীয় তেমনি অপরদিকে পরীক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ তায়ালা বলেন-
اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

অর্থাৎ আমি পার্থিব সবকিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি মানুষকে পরীক্ষার জন্য যাতে তাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে কে শ্রেষ্ঠ ? (সেটা বাছাই করা যায়) (সূরা কাহাফ-৭) । সূরা মুল্কের ২নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ

অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য-কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল)। এখানে 'হায়াত' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবন ও জীবন পরিচালনার সকল উপায়-উপকরণ এবং আল্লাহ প্রদত্ত সকল নেয়ামত।

❑ আলোচ্য আয়াতে সর্বপ্রথম মহিলার প্রতি আকর্ষণের কথা উল্লেখ হয়েছে। কারণ সাবালক হওয়ার পর প্রত্যেক পুরুষের সব থেকে বেশী প্রয়োজনবোধ হয় একজন সঙ্গিনীর । 'Mutual attraction between man & woman and to the opposite gender is totally biological & natural phenomenon'.

আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আঃ) থেকে শুরু করে আজ অবধি এ ধারাই চলমান। তাছাড়া রমণী পুরুষের কাছে সর্বাধিক রমণীয় ও কমণীয়। স্বয়ং নবী করিম (সাঃ) বলেছেন: দুনিয়ার দুটি জিনিস আমার সবচেয়ে প্রিয়: সতী নারী ও সুগন্ধি, আর সালাত আমার চোখের শীতিলতা (সুনানে নাসাঈ: ৩৯৪০)। তিনি আরো বলেন : পার্থিব জীবন পুরোটাই ভোগের সামগ্রী আর সতী নারী সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সমগ্রী (মুসলিম শরীফ: ১/ ৪৭৫)। রাসূল (সাঃ) আরো বলেন- কৃতজ্ঞ আত্মা, আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত জিহ্বা, পার্থিব ও পরকালীন কাজে সহযোগী সতী স্ত্রী মানুষের জমাকৃত সম্পদ থেকে সর্বাধিক উত্তম (সহীহ আল জামেঈ-৪৪০৯)। তবে শর্ত হলো নারীর প্রতি ভালবাসা হতে হবে শরীয়ত সম্মত ও আধিক্য বর্জিত, তবেই নারী হবে উত্তম জীবন সঙ্গিনী ও আখেরাতের সম্বল। নচেৎ নারীই হলো দুনিয়ার সর্বাপেক্ষা বড় ফেৎনা। রসূল (সাঃ) বলেন- আমার ইন্তেকালের পরে আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য নারী অপেক্ষা অধিক ফিতনার শংকা আর কিছুতেই রেখে যাইনি। (সহীহ বুখারী-৫০৯৬, সহীহ মুসলিম -২৭৪০)। দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্ক করে নবী করীম (সাঃ) বলেন- দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন, অতঃপর তিনি দেখবেন তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং সাবধান হও নারী জাতির ব্যাপারে । (সহীহ মুসলিম -২৭৪২, জামে তিরমিযি-২১৯১)

বর্তমান অস্থির ও Paradoxical World এ যুবসমাজের অধ:পতন ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের জন্য মূখ্য দায়ী নারীদের সাথে অবাধ মেলামেশা, Social Network এর মাধ্যমে যোগাযোগ ও ভাব বিনিময়ের সহজলভ্যতা, তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে নারীদেরকে ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে উপস্থাপনের আয়োজন, ইসলামের সীমারেখা বহির্ভূত নারী পুরুষের জড়ো হওয়ার অবাধ সুযোগ, বিভিন্ন প্যাকেজের নামে তরুণ তরুনীদেরকে মোহের (illusion)জগতে ছেড়ে দেয়া, আকাশ সংস্কৃতির ভয়াল থাবা, পর্দাকে সেকেলে প্রথা হিসেবে উপস্থাপনের হীন প্রয়াস ইত্যাদি। চারপাশের যুবক-যুবতীদের দেখলে মনে হয়, তারা যেন এক অস্থির মোহে ঘোরপাক খাচ্ছে। রাতের অন্ধকারই যেন তাদের খোশগল্প ও ভাব বিনিময়ের মোক্ষম সুযোগ আর দিনের আলোতেই তাদের ঘুমানোর সময়। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا - وَّ جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا - وَّ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

অর্থাৎ তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, রাতকে করেছি আবরণ এবং দিনকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়। (সূরা নাবা: ৯-১১)।

❑ মানব প্রকৃতির সাথে সুশোভিতকরণের দ্বিতীয় বিষয় হলো البنين এটির একবচন ابن। সন্তান-সন্ততি, offspring। যা মা-বাবার জন্য রবের পক্ষ থেকে পরম ও কাঙ্ক্ষিত নেয়ামত। حب النساء এর পরপর حب البنين আনার কারণ হলো- সন্তান-সন্ততি حب النساء এর ফসল । সন্তান-সন্ততি অহংকারের কারণ। রাসূল (সাঃ) বলেন- সন্তান-সন্ততি অন্তরের ফসল, এটি পিতাদের কাপুরুষতা, কৃপণতা ও চিন্তার কারণ। সন্তানের প্রতি মা বাবার অকৃত্রিম ভালবাসা ও মা-বাবার প্রতি সন্তানের অগাধ অনুরাগ একান্তই প্রাকৃতিক । একজনের অনুপস্থিতি অপর জনকে সদা তাড়া করে ফিরে, কাছে পাওয়ার আকুলতা তাকে অস্থির করে তোলে। মা-বাবা ও সন্তান-সন্ততির অভেদ্য ভালবাসা ও অকৃত্রিম অনুরাগ নিরেট আল্লাহরই দান। সন্তান-সন্ততিই পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্য ও জেনারেশনের ধারাবাহিকতার শৃংখল ও প্রবাহ। আল কোরআনের ভাষায় اَلْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَ الْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ خَيْرٌ اَمَلًا অর্থাৎ ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট (সূরা কাহাফ-৪৬)।

সূরা নাহালের ৭২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে- وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ অর্থাৎ মহান আল্লাহ তোমাদের থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের উত্তম জীবনোপকরণ দিয়েছেন। তবুও কি তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করবে এবং তারা কি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

পবিত্র কোরআনে البنين এর চারটি সমার্থক শব্দ মোট ৭৫ বার উল্লেখ আছে। যেমন- (১) طفل (শিশু, বালক), (২) صبي (শিশু, কিশোর), (৩) غلام (শিশু, তরুণ), (৪) ولد (শিশু, বৎস, সন্তন)। طفل শব্দটি আল্ কোরআনে ৩ বার ও এর বহুবচন اطفال আছে ১ বার। صبيى শব্দটি আল্ কোরআনে ২ বার, غلام শব্দটি ১২ বার এসেছে। এর দ্বিবচন غلامان কর্মকারকরূপে غلامين আছে একবার, বহুবচনে غلمان আছে ১ বার। ولد শব্দটি কোরআনে আছে ৩৩ বার, এর বহুবচন اولاد শব্দটি এসেছে ২২ বার। এরকম প্রিয়, নেয়ামততুল্য সন্তান-সন্ততিকে আলাহ তায়ালা আবার পরীক্ষার মাধ্যমও বানিয়েছেন। তিনি বলেন- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَ اِنْ تَعْفُوْا وَ تَصْفَحُوْا وَ تَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সর্তক থাকবে । তোমার যদি তাদেরকে মার্জনা কর, তাদের দোষক্রটি উপেক্ষা কর এবং তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা তাগাবুন: ১৪)

একই সূরার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে:

اِنَّمَاۤ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষা বিশেষ। আর আল্লাহ, তাঁরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার (সূরা তাগাবুন: ১৫)। অনেক সময় এ আদরের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর হুকুম পালনে ও দ্বীনের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে।

সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে- قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَ اَبْنَاؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

অর্থাৎ বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালবাসো ইত্যাদি যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তবে আল্লাহর সিদ্ধান্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। সূরা মুনাফিকুনের ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

অর্থাৎ- হে মুমিনগণ। তোমাদের প্রাচুর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

❑ তৃতীয় বিষয় হলো- والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة অর্থাৎ সোনা-রুপার রাশি রাশি স্তুপ। এখানে قناطير শব্দটি قنطار এর বহুবচন। قنطار এর পরিমাণ বর্ণনা করতে গিয়ে মুহাদ্দীসীনে কেরাম দুটি মত ব্যক্ত করেছেন।

১। গণনাযোগ্য, যেমন-

- হযরত উবাই বিন কাব (রাঃ) ও মুআ'য বিন জাবল (রা:) এর মতে বারশত আওকিয়া।
- হযরত আবু হুরায়রা (রা:) এর মতে বার হাজার আওকিয়া।
- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) এর মতে বারশত দিনার।
- হাসান ও দাহ্‌হাক (রা:) এর মতে বার হাজার দেরহাম।
- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) এর মতে সত্তর হাজার দিনার।
- সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (রা:) এর মতে আশি হাজার দেরহাম।
- ইমাম আতা (র:) এর মতে সাত হাজার দিনার।
- ইমাম সুদ্দী (র:) এর মতে আট হাজার মিছকল।
- ইমাম কলবী (র:) এর মতে এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ বা রৌপ্য।

২। অগণনাযোগ্য: যেমন- রাবী বিন আনাস (রা:) বলেন, قنطار অর্থ পর্যাপ্ত সম্পদ।

- আবু ওবায়দা (রা:) বলেন, قنطار হচ্ছে এমন ওজন, যা পরিমাপ করা যায় না। ইবনে জারীর তাবারী (রা:)ও এমত পোষণ করেন। আর المقنطرة অর্থ المضعفة অর্থাৎ দ্বিগুণ, ইবনে আব্বাস (রা:) এমত ব্যক্ত করেন।
- ইবনে কুতায়বা (রা:) বলেন- المقنطرة অর্থ المكملة অর্থাৎ- পরিপূর্ণ (الله أعلم بمراده به)। এককথায় রাশি রাশি সম্পদের স্তুপকে বুঝানো হয়েছে। মানব মাত্রই সম্পদের প্রয়োজন। তবে সে প্রয়োজনীয়তা যেন লোভে পরিণত না হয়, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন করে দেয়।

কোরআনের ভাষায়- اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ অর্থাৎ প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও (সূরা তাকাসুর: ১-২)। অন্য সূরায় আছে-

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ـ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّ عَدَّدَهٗ ـ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗۤ اَخْلَدَهٗ ـ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ـ

অর্থাৎ দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গণনা করে। সে ধারণা করে যে, তার সঞ্চিত অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায় (সূরা হুমাযাহ: ১-৪)। সূরা লাহাবে বর্ণিত আছে-

تَبَّتْ يَدَاۤ اَبِىْ لَهَبٍ وَّ تَبَّ ـ مَاۤ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَ مَا كَسَبَ

অর্থাৎ ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও, তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন কোন কাজে আসেনি অর্থাৎ আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে কোন কাজ দেয়নি (সূরা লাহাব: ১-২)। সম্পদের প্রতি মানুষের মোহ অত্যধিক। কুরআনের ভাষায়- وَ اِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ অর্থাৎ মানুষ অবশ্যই ধন সম্পদের আসক্তিতে প্রবল (সূরা আদিয়াত: ৮)। অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে:

وَ تَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ـ وَّ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا অর্থাৎ এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেল আর ধনসম্পদকে অতিশয় ভালবাসো (সূরা ফজর: ১৯-২০)। হাদীসের ভাষায়- يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ مِثْلَ وَادٍ مَالاً لأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلاَ يَمْلأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

অর্থাৎ বনী আদমের যদি দুই উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ থাকে, সে তৃতীয় উপত্যকা বাসনা করবে আর বনী আদমের পেট কবরের মাটি ছাড়া পূর্ণ হবে না। আর আল্লাহ তাওবাকারীদের অনুশোচনা কবুল করেন (সহীহ বুখারী (ইফা)- ৫৯৯৪)।

❑ ৪র্থ বিষয় হচ্ছে الخيل المسومة অর্থাৎ প্রশিক্ষিত ঘোড়া, الخيل অর্থ Horse, ঘোড়া, আর المسومة অর্থ - الراعية - المعلمة - المطهمة - الحسان - المرسلة , Branded, Marked উৎকৃষ্ট, চিহ্নিত, প্রশিক্ষিত। তৎকালীন আরব ও সমকালীন বিশ্বে ঘোড়ার আলাদা কদর রয়েছে। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে নববীতে ঘোড়ার বর্ণনা ও অনন্য বৈশিষ্ট্য বারংবার এসেছে। যেমন- সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াতে

وَ اَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ اٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ۚ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ۚ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এতদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ ও তোমাদের শত্রুকে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে যাদেরকে তোমরা জান না। সূরা আদিয়াতের ১-৫নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَ الْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ـ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ـ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ـ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ـ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ـ অর্থাৎ শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির, অত-ঃপর যারা খুরের আঘাতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে, তারপর যারা অভিযান করে প্রভাতকালে, ফলে তারা তা দ্বারা ধূলি উড়ায়, অতঃপর তা দ্বারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। সূরা নাহালের ৮নং

আয়াতে বলা হয়েছে-

وَّ الۡخَیۡلَ وَ الۡبِغَالَ وَ الۡحَمِیۡرَ لِتَرۡکَبُوۡهَا وَ زِیۡنَۃً ؕ وَ یَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

অর্থাৎ তোমাদের আরোহনের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা অবগত নও। ঘোড়া সম্পর্কে হাদীসে নববীতে বর্ণিত আছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন- রাসুল (সাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ বেঁধে রেখেছেন। ঘোড়া তিন প্রকার: এক প্রকার ঘোড়া, যা দ্বারা মানুষ সওয়াব লাভ করে, আর এক প্রকার ঘোড়া যা (অস্বচ্ছলতার জন্য) আচ্ছাদন (ঢালস্বরূপ) হয়ে থাকে এবং অন্য প্রকার যা বোঝা স্বরূপ হয়ে থাকে। সওয়াবের ঘোড়া তো ঐ ঘোড়া, যাকে মালিক লালন পালন করে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য এবং প্রয়োজনমত তাকে জিহাদে ব্যবহার করা হয়। যা কিছু সে খায়, যা কিছু তার পেঠের ভেতরে গায়েব করে, তা সবই তার জন্য সওয়াব লিখা হয়। যদিও নতুন চারণ ভূমিতে সে তার সামনে উদ্ভাসিত হয় (সুনানে নাসায়ী-৩৫৬৩)। অন্য রেওয়াতে আছে, মালিক তার রশি বাগান ও চারণভূমিতে লম্বা করে দেয়, সেই ঘোড়া সে রশিতে থেকে যতদুর পর্যন্ত চরবে, তার জন্য নেকী লেখা হবে। যদি সে রশি ছিড়ে কোন উঁচু স্থানে চরে, তবে তার প্রত্যেক পদক্ষেপের জন্য নেকী লেখা হবে। হারিস (রা:) এর রেওয়াতে আছে তার গোবরের জন্যও নেকী লেখা হবে। যদি ঐ ঘোড়া কোন নহরে গিয়ে পানি পান করে, অথচ মালিকের পানি পান করাবার ইচ্ছা না থাকে, তবুও তা মালিকের জন্য নেকীরূপে লেখা হবে। আর যে তা স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য বেঁধে রাখে অথবা মানুষের কাছে চাওয়া থেকে বাঁচার জন্য এবং তার ঘাড়ে ও পিঠে পালনীয় মহান মহীয়ান আল্লাহর হক্ব এর কথা বিস্মৃত হয় না (যাকাত আদায় করে) তবে তা মালিকের জন্য আচ্ছাদন। আর ঐ ব্যক্তির জন্য পাপ, যে ব্যক্তি তাকে গর্ব করা, লোক দেখানো ও মুসলিমের সাথে শত্রুতার জন্য বাঁধে (পালন করে) (সুনানে আন নাসায়ী: ৩৫৬৪)।

একবার এক ব্যক্তি রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:)! জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে? রাসূল (সা:) বলেন, আল্লাহ যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান, তাহলে এতে লাল এয়াকুত পাথরের যে ঘোড়ায় চড়তে চাও, সে তোমাকে নিয়ে জান্নাতের যেখানে যেতে চাও সেখানে উড়ে নিয়ে যাবে।

❑ ৫ম বিষয় হলো الأ نعام অর্থাৎ دابة, চতুষ্পদ প্রাণী, Four footed beast যেমন- উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি। পবিত্র কোরআনে ২০০ আয়াতে প্রাণী সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে এবং মোট ৩৫টি প্রাণীর নাম উল্লেখ রয়েছে। এর মধ্যে পাখি, পোকা-মাকড়, বন্যপ্রাণী ও পোষাপ্রাণী। কয়েকটি সূরা প্রাণীর নামেও রয়েছে, যেমন- سورة البقرة (গাভী)। সরাসরি الا نعام নামেও একটি সূরা আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ الۡاَنۡعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَکُمۡ فِیۡهَا دِفۡءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنۡهَا تَاۡکُلُوۡنَ وَ لَکُمۡ فِیۡهَا جَمَالٌ حِیۡنَ تُرِیۡحُوۡنَ وَ حِیۡنَ تَسۡرَحُوۡنَ অর্থাৎ- আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো, তিনি তা সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য তাতে শীত নিবারক উপকরণ ও বহু উপকার রয়েছে এবং সেগুলো থেকে তোমরা আহার করে থাক, আর তোমরা যখন গোধূলি লগ্নে তাদেরকে চারণভূমি হতে ঘরে নিয়ে আস এবং প্রভাতে যখন তাদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা তাদের সৌন্দর্য উপভোগ কর (সূরা নাহল: ৫-৬)। সূরা আনআমের ৩৮নং আয়াতে বলা হয়েছে-

وَ مَا مِنۡ دَآبَّۃٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا طٰٓئِرٍ یَّطِیۡرُ بِجَنَاحَیۡهِ اِلَّاۤ اُمَمٌ اَمۡثَالُکُمۡ ؕ مَا فَرَّطۡنَا فِی الۡکِتٰبِ مِنۡ شَیۡءٍ ثُمَّ اِلٰی رَبِّهِمۡ یُحۡشَرُوۡنَ অর্থাৎ আর যমীনে বিচরণশীল প্রতিটি জীব বা দু'ডানা দিয়ে উড়ে এমন প্রতিটি পাখি, তোমাদের মত এক একটি উম্মত। এ কিতাবে আমরা কোন কিছুই বাদ দেইনি; তারপর তাদেরকে তাদের রব-এর দিকে একত্র করা হবে। সূরা আন্ নূরের ৪৫ নং আয়াতে বর্ণিত আছে- وَ اللّٰهُ خَلَقَ کُلَّ دَآبَّۃٍ مِّنۡ مَّآءٍ ۚ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّمۡشِیۡ عَلٰی بَطۡنِهٖ ۚ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّمۡشِیۡ عَلٰی رِجۡلَیۡنِ ۚ وَ مِنۡهُمۡ مَّنۡ یَّمۡشِیۡ عَلٰۤی اَرۡبَعٍ ؕ یَخۡلُقُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرٌ অর্থাৎ আল্লাহ সমস্ত জীব সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। উহাদের কতেক পেঠে ভর দিয়ে চলে, কতেক দু'পায়ে চলে, কতেক চলে চার পায়ে, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশক্তিমান। পশু পাখির অধিকার রক্ষার ব্যাপারে হাদীসে নববীতে রাসূল (স:) বারবার সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন- 'যখন তোমরা হালাল পশু জবাই করবে, সর্বোত্তম পন্থায় করবে। জবাইয়ের বস্তু ভালভাবে ধার দিয়ে নিবে আর পশুটিকে স্বাভাবিকভাবে প্রাণ বের হওয়ার সুযোগ দিবে' (সহীহ মুসলিম-১৯৫৫)। সূরা গাফির এর ৭৯নং আয়াতে বর্ণিত আছে- اَللّٰهُ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَنۡعَامَ لِتَرۡکَبُوۡا مِنۡهَا وَ مِنۡهَا تَاۡکُلُوۡنَ অর্থাৎ আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য গবাদিপশু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার কিছু সংখ্যকের উপর তোমরা আরোহণ কর এবং কিছু সংখ্যক হতে তোমরা খাও। সূরা মু'মিনুনের ২১নং আয়াতে বর্ণিত আছে- وَ اِنَّ لَکُمۡ فِی الۡاَنۡعَامِ لَعِبۡرَۃً ؕ نُسۡقِیۡکُمۡ مِّمَّا فِیۡ بُطُوۡنِهَا وَ لَکُمۡ فِیۡهَا مَنَافِعُ کَثِیۡرَۃٌ وَّ مِنۡهَا تَاۡکُلُوۡنَ অর্থাৎ এবং প্রাণীকুলে তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তোমাদেরকে আমি ওদের উদরে যা আছে তা হতে পান করাই, এটাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা এবং তোমরা ওটা থেকে আহার কর।

❑ ৬ষ্ঠ বিষয় হলো الزرع والنبات অর্থ الحرث ক্ষেত-খামার, চাষাবাদ, cultivation. الدنيا حرث অর্থ متاع الحياة الدنيا من مال وبنين وغيرهما - অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি ইত্যাদি পার্থিব উপায় উপকরণ। حرث الاخرة অর্থ العمل الصالح الباقى অর্থাৎ স্থায়ী সৎ কর্ম। যেমন আল্ কোরআনে বর্ণিত হয়েছে- مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ অর্থাৎ আর যে কেউ আখিরতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বৃদ্ধি করে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে ওটার কিছু অংশ দেই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না (সূরা আশ্-শুরা-২০)। সূরা নাহলের ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে- یُنۡۢبِتُ لَکُمۡ بِهِ الزَّرۡعَ وَ الزَّیۡتُوۡنَ وَ النَّخِیۡلَ وَ الۡاَعۡنَابَ وَ مِنۡ کُلِّ الثَّمَرٰتِ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیَۃً لِّقَوۡمٍ یَّتَفَکَّرُوۡنَ

অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য (পানি দ্বারা) শস্য, যায়তুন, খেজুর বৃক্ষ, আঙ্গুর ও সর্বপ্রকার ফল জন্মান। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। সূরা মুলকের ১৫নং আয়াতে বর্ণিত আছে- هُوَ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ ذَلُوۡلًا فَامۡشُوۡا فِیۡ مَنَاکِبِهَا وَ کُلُوۡا مِنۡ رِّزۡقِهٖ ؕ وَ اِلَیۡهِ النُّشُوۡرُ অর্থাৎ তিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা উহাতে দিগ্-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ করো। পূনরুত্থান তো তারই

নিকট। আল্লাহ তায়ালা বলেন- فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ - أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا - ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا - فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا - وَعِنَبًا وَقَضْبًا - وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا - وَحَدَائِقَ غُلْبًا - وَفَاكِهَةً وَأَبًّا - مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ - অর্থাৎ মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুক, আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি, অতঃপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদীর্ণ করি এবং উহাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যায়তুন, খেজুর, বহু বৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল, গবাদি খাদ্য, ইহা তোমাদের ও তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুদের ভোগের জন্য (সূরা আবাসাঃ ২৪-৩২)। রাসূল (সঃ) বলেন যার একখন্ড জমি রয়েছে সে যেন তা আবাদ করে যদি সে আবাদ করতে না পারে, তার উচিত, সে যেন তা অন্য কাউকে দান করে, যাতে সে আবাদ করে ভোগ করতে পারে (সহীহ আল জামেঈঃ ৬৫১৪)। চাষাবাদের প্রতি যেমনি উৎসাহিত করা হয়েছে, তেমনি আবার অতিমাত্রায় আসক্তিও পরীক্ষার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কিছু মানুষের পার্থিব জীবনের উপকরণ ও ব্যবহারের ভোগ্য বস্তু মাত্র وَ مَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّ لَعِبٌ ؕ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ আর এ দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয় এবং নিশ্চয় আখিরাতের নিবাসই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত (সূরা আনকাবুতঃ ৬৪)। مَتَاع হচ্ছে মূলত ঘ্রাণের মতই। ঘ্রাণের যেমন বস্তুগত কোন অস্তিত্ব নেই, এটি Abstract, তেমনি আল্লাহ তায়ালা এসব কিছুকে ঘ্রাণের মত অস্থীত্বহীন মোহের সাথে তুলনা করেছেন। দ্বীপবাসী যেমন লঞ্চ ব্যবহার করে গন্তব্যে পৌঁছে, এটি তার স্থায়ী নিবাস নয়, শুধুমাত্র গন্তব্যে পৌঁছাতে ব্যবহার করে, তেমনি মুসলিম ও মুমিন বান্দাও পার্থিব জীবনে উল্লেখিত সম্পদের মালিক হবে, ব্যবহার ও অর্জন করবে। কিন্তু এগুলোকেই যেন চূড়ান্ত অর্জন ও সফলতা মনে না করে। কারণ তাকে তো পার্থিব ক্ষণিকের জীবন সাঙ্গ করে অনন্ত হায়াতের সমুদ্র পানে পাড়ি দিতে হবে। এজন্য আল্লাহ বলেন- والله عنده حسن المآب অর্থাৎ আল্লাহর কাছেই আছে উৎকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল। সূরা বাক্বারার ২৮১নং আয়াতে বর্ণিত আছে وَ اتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ ۗ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ অর্থাৎ আর তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের (বিন্দু পরিমাণ) যুলুম করা হবে না। তিনি তো আমাদের জন্য অফুরন্ত নিয়ামত এর ব্যবস্থা করে রেখেছেন, কোরআনের ভাষায়- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا অর্থাৎ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান (সূরা কাহাফঃ ১০৭)। সূরা ত্বীনের ৬নং আয়াতে বর্ণিত আছে-

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ

অর্থাৎ কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরষ্কার। সূরা ফোরকানের ৭৫নং আয়াতে বর্ণিত আছে-اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَ يُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّ سَلٰمًا- অর্থাৎ তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান, যেহেতু তারা ছিল ধৈর্যশীল, তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ

প্রথমত ঃ বৈষয়িক সম্পদের প্রতি আকর্ষণ প্রতিটি মানুষের সহজাত প্রকৃতি কিন্তু বিপদজ্জনক বিষয় হলো, বৈষয়িক চাকচিক্যের মোহে প্রতারিত হওয়া ও পরকালের জবাবদিহিতার কথা ভুলে যাওয়া। সূরা কিয়ামাহ এর ২০-২১নং আয়াতে বলা হয়েছে

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ - وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ

অর্থাৎ কখনো না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর। সূরা ইনফিতারের ৬নং আয়াতে বর্ণিত আছে- يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ অর্থাৎ হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল?

দ্বিতীয়ত ঃ পার্থিব বিষয় ও আশ্রয়কে ব্যবহার করা ও সে সবের প্রতি আকর্ষণ মন্দ নয়। কিন্তু পার্থিব বিষয় ও আশ্রয়ের মোহের জালে আটকে পড়া এবং এসবের উপর নির্ভর করা ক্ষতিকর।

তৃতীয়ত ঃ আমাদের আশা-আকাঙ্খা নিয়ন্ত্রণের জন্য আল্লাহ তায়ালার স্থায়ী নেয়ামতের সাথে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী নেয়ামতের তুলনা করতে হবে।

وَ فَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ

অর্থাৎ 'কিন্তু তারা তো পার্থিব জীবনে উল্লাসিত অথচ দুনিয়ার জীবন তো আখিরাতের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী ভোগ্যবস্তু মাত্র'। (সূরা আর্ রা'দঃ ২৬)

চতুর্থত ঃ আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, মহান আল্লাহর দিকেই আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য (Ultimate destination)

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ - ارْجِعِىْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً - فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْ - وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ

অর্থাৎ হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর (সূরা ফজরঃ ২৭-৩০)।

পঞ্চমত ঃ পার্থিব জীবন ও জীবনোপকরণ খেল তামাশা বৈ কিছুই নয়। সূরা আন'আমের ৩২ নং আয়াতে বর্ণিত আছে-

وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَاۤ اِلَّا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ ؕ وَ لَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ আর দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ও তামাশা ছাড়া কিছু না। আর যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আখিরাতের আবাস উত্তম। অতএব তোমরা কি বুঝবে না? মহান আল্লাহ আমাদেরকে পার্থিব ও পরকালীন সফল ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করুন। মহান আল্লাহর শেখানো ভাষায় আমাদের ফরিয়াদঃ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ অর্থাৎ হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতে ও কল্যাণ দান কর আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাক্বারাঃ ২০১) আমীন।

লেখক ঃ অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল ইংলিশ স্কুল চিটাগাং।

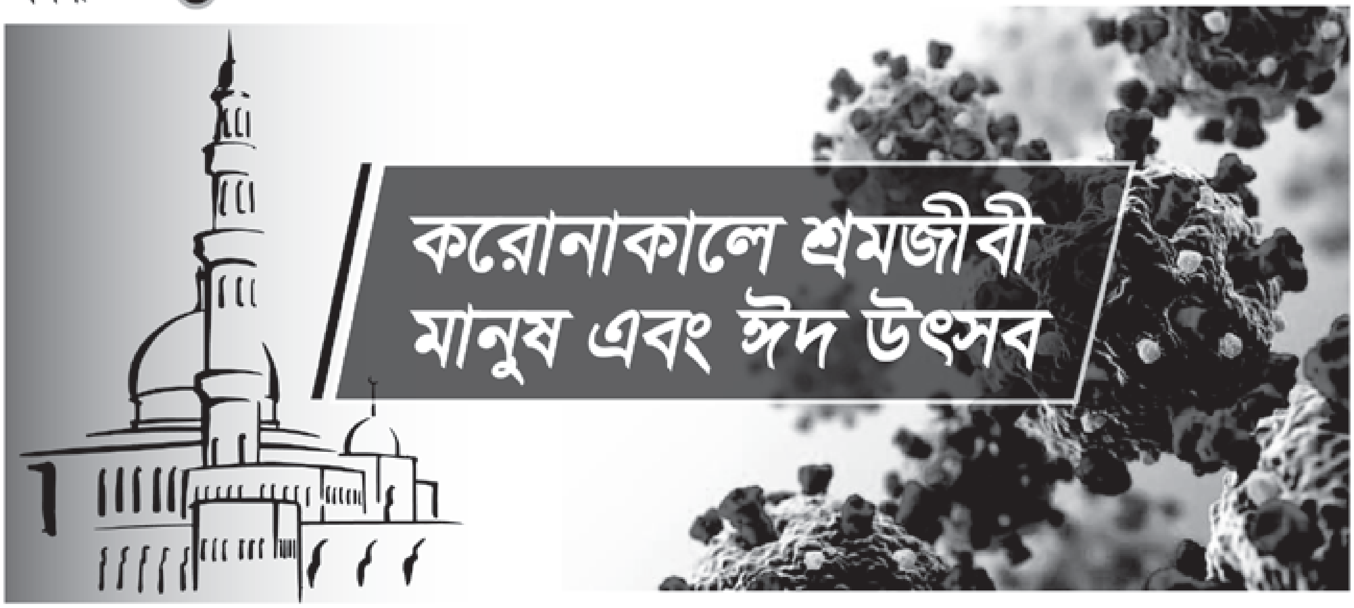

করোনাকালে শ্রমজীবী মানুষ এবং ঈদ উৎসব

ড. মাহফুজুর রহমান আখন্দ

"জলে কুমির ডাঙায় বাঘ" প্রবাদটি ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে বড় হওয়া। এখন বাস্তবতার মুখোমুখি। লকডাউনে ঘরে থাকলে না খেয়ে মরা আর বাইরে বের হলে অদৃশ্য শত্রু করোনার ছোবলে আত্মবলি। কোন দিকে যাবে দেশের মানুষ! দরোজায় কড়া নাড়ছে ঈদুল আজহা। মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। প্রত্যেক মুসলমান সামর্থ অনুয়ায়ী কুরবানীর আয়োজন করে থাকেন এই ঈদে। কুরবানীর সৌন্দর্যই এ ঈদের প্রধানতম বিষয়। ত্যাগের নজরানা, খুলুসিয়াত এবং আল্লাহ প্রেমের এক অভুতপূর্ব অনুভূতি সঞ্চার করে এ কুরবানী। বলা চলে, সামর্থের কিছুটা ঘাটতি থাকলেও বিশ্বাসী মানুষেরা কষ্ট করে হলেও কুরবানীতে অংশগ্রহণের চেষ্টা করে থাকেন। সেই কুরবানীর প্রসঙ্গ তো দূরের কথা করোনাকালের এ ভয়াবহ সময়ে পেটের ভাতের যোগান দিতে পারছেন না শ্রমজীবী মানুষ। অন্যদিকে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রায় সকল বিনিয়োগকারী মালিকেরাও বিপাকে। কর্মচারীদের দেনা পাওনার হিসেব কষতেই দিশেহারা হয়ে গেছেন তারা। অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন, কাজ চলছে না, শ্রমিকদের বেতন বন্ধ করে দেন। বাপের ঘর থেকে টাকা এনে পুরাবেন নাকি? কিন্তু কি আর করার? বেতন না পেলে শ্রমিকরা খাবে কি? এ সব চিন্তায় খানিকটা বেখেয়াল হয়ে পড়েছেন বিবেকবান কিছু মালিক। আবার বিবেকহীন মালিকেরা তো আগেই লাপাত্তা। কাজ নেই, ঘরে বসে মরো। কিচ্ছু করার নেই। এমন দুঃসংবাদের বোঝা মাথায় নিয়েই উদযাপিত হচ্ছে কুরবানীর ঈদ 'ঈদুল আজহা'।

করোনা আমাদের সমাজজীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। অদৃশ্য এ ভয়াল শত্রু সকলের জীবনে বয়ে এনেছে ভয়ংকর যন্ত্রণা ও মৃত্যুর আতঙ্ক। ভীষণ খারাপ পরিস্থিতি আমাদের সামনে। চারপাশের মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপদ জীবনযাপনের অবস্থা এখন ভীষণ সংকটাপন্ন। করোনা থেকে বাঁচতে নিজস্ব স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি ও করোনাকালে মানুষ বাঁচানোর প্রশ্নে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে সফল হতে পারেনি সরকার অর্থনীতি অনিশ্চয়তার খাদে তলিয়ে যাচ্ছে। দেশের সিংহভাগ শিল্প ও ব্যবসা

করোনা আমাদের সমাজজীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। অদৃশ্য এ ভয়াল শত্রু সকলের জীবনে বয়ে এনেছে ভয়ংকর যন্ত্রণা ও মৃত্যুর আতঙ্ক। ভীষণ খারাপ পরিস্থিতি আমাদের সামনে। চারপাশের মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপদ জীবনযাপনের অবস্থা এখন ভীষণ সংকটাপন্ন। করোনা থেকে বাঁচতে নিজস্ব স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি ও করোনাকালে মানুষ বাঁচানোর প্রশ্নে কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে সফল হতে পারেনি সরকার।

আমাদের অর্থনীতি রফতানি আয়, রেমিট্যান্স, কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এই ৪টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। করোনা সংক্রমণের কালে এর প্রত্যেকটিই পড়েছে সংকটের মুখে। রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আয় করে যে খাত সেই গার্মেন্টস খাতের নড়বড়ে চেহারা। তবুও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই গার্মেন্টসহ অপরাপর কলকারখানার শ্রমিকদের চালিয়ে রাখতে হয়েছে উৎপাদনের চাকা। এরপরও কারখানায় কারখানায় লে-অফ, শ্রমিক ছাটাই, আইনী প্রাপ্য পাওনাদী না দেয়া, ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা বাধ্যতামূলক কাজ করানো এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। শ্রম আইনের নামে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নতুন নতুন ফাঁদ তৈরী করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠান এবং ছোটখাটো কল-কারখানাও বন্ধ। গণপরিবহন ও বিমান চলাচল প্রকারান্তরে স্থগিত। আমাদের আমদানি-রপ্তানির ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। বেশিরভাগ দেশে প্রবাসীরা কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। স্থবিরতা নেমে এসেছে রেমিট্যান্স প্রবাহেও।

কভিটের মতো বৈশ্বিক মহামারিতে মানুষের জীবন রক্ষা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করতে হলে মানুষের অর্থের প্রয়োজন, সম্পদের প্রয়োজন। পিপল সেন্ট্রিক ডেভেলপমেন্ট মানেই হলো মানুষের আয়ের সংস্থান করা, তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সব উপকরণের ব্যবস্থা করা। জীবন রক্ষা করতে গিয়ে জীবিকার ওপর আঘাত এসেছে। আবার জীবিকা অব্যাহত রাখতে গিয়ে জীবন হুমকির মুখে পড়েছে। তবে জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়লেও মানুষ জীবিকাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। তাই একদিকে করোনা ভাইরাসে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, আরেক দিকে মানুষকে বেঁচে থাকার জন্য জীবিকার পথ অবলম্বন করতে হচ্ছে। তাতে কঠিন হয়ে পড়েছে মহামারি প্রতিরোধের কাজ। মহামারির মধ্যেই অনেক তরুণ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। আবার অনেকে বেকার হয়ে পড়েছে। এখন তাদের কাজের মধ্যে না রাখলে, তাদের কাজ না দিলে অর্থনীতিকে তার পথে নিয়ে আসা কঠিন হয়ে পড়বে।

করোনা মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, আইইডিসিআরসহ বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীনতা ও সীমাহীন ব্যর্থতা, স্বাস্থ্যখাতে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা লুটপাট এখন ওপেন সিক্রেট। তার উপরে ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটের কারণে যেন নিত্য পণ্যের উর্ধ্বগতি লাগাম টেনে ধরাই যাচ্ছেনা। এ অবস্থায় দিন এনে দিন খাওয়া মানুষগুলোর জীবন জীবিকা নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। মৃত্যু ভয়কে উপেক্ষা করে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের হাড় ভাংগা পরিশ্রমের কারণে এখনও টিকে রয়েছে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি। তবে ইতোমধ্যে করোনায় নতুন করে আড়াই কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে নেমে এসেছে। আমাদের অর্থনীতি রফতানি আয়, রেমিট্যান্স, কৃষি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এই ৪টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। করোনা সংক্রমণের কালে এর প্রত্যেকটিই পড়েছে সংকটের মুখে। রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি আয় করে যে খাত সেই গার্মেন্টস খাতের নড়বড়ে চেহারা। তবুও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েই গার্মেন্টসহ অপরাপর কলকারখানার শ্রমিকদের চালিয়ে রাখতে হয়েছে উৎপাদনের চাকা। এরপরও কারখানায় কারখানায় লে-অফ, শ্রমিক ছাটাই, আইনী প্রাপ্য পাওনাদী না দেয়া, ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা বাধ্যতামূলক কাজ করানো এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। শ্রম আইনের নামে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী নতুন নতুন ফাঁদ তৈরী করা হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই বাংলাদেশের কৃষকসমাজ ভাত, সবজি, মাছ, ডিম, মুরগি, দুধ, মাংস, ফলসহ খাদ্যপণ্যের উৎপাদন করে চলেছে। অথচ সেই মানুষগুলোও আজ অনেক বেশী উপেক্ষিত। অধিকার বঞ্চিত। কৃষক তাঁর নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্য কিনতে গিয়েও ঠকছে আবার বেঁচতে গিয়েও ঠকছে। সরকারের ভুল নীতির কারণে একদিকে কৃষক তার কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাননি অপরদিকে এই করোনা কালে অধিক পয়সা খরচ করেও অনেকেই উৎপাদিত ফসল গোলায় তুলতে পারেননি, বিক্রয় ও বিপনন করতেও পড়েছেন নানা সংকটে।

বাংলাদেশের পরিবহণ শ্রমিক, রিকশাচালক, দোকান কর্মচারীসহ অন্য শ্রমিকরা লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়েছে। রাজধানীতে প্রায় দুই লাখ মোটর সাইকেল চালক আছেন। রাইড শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে তাদের সংসার চলে। এই সেবার ওপর নির্ভর করে অন্তত ৩০ লাখ মানুষের

খাবার আসে। সরকার এসবের কোনো কিছু না ভেবে সরাসরি সেবাটি বন্ধ করে দিয়েছে। বিকল্প কর্মসংস্থানেরও কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। রাইড শেয়ারিংয়ে মোটর সাইকেলসেবা চালু বা বিকল্প কর্মসংস্থান করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন চালকরা। তারা বলছেন, সরকার আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিক অথবা আমাদের বাইক চালানোর সুযোগ দেওয়া হোক, আমরা নিজেরাই আমাদের খাবার খুঁজে নেব।

করোনা মহাবিপর্যয়ে মানুষ অসহনীয় স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে সরকার রাষ্ট্রীয় পঁচিশটি পাটকল বন্ধ করে দিয়ে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিককে জীবিকাহীন করে রেখেছে। লাখ লাখ পাটচাষীকে অনিশ্চয়তা ও ব্যক্তিমালিকানাধীন পাটকল মালিকদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছে। শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদসহ শ্রমিক সংগঠনগুলো হিসেব দিয়ে দেখিয়েছে মাত্র বারো'শ কোটি টাকা খরচ করে পাটকলগুলো আধুনিকায়ন করা সম্ভব। কিন্তু সরকার রাষ্ট্রীয় কারখানাগুলো বিরাষ্ট্রীয়করণ করে তার পঁচিশ হাজার কোটি টাকার সম্পদ দলীয় লোকদের মালিকানায় দিতে চায় বলে পাঁচ হাজার কোটি টাকা খরচ করে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক এর নামে ছাঁটাই করতে দ্বিধা করছে না। সরকারের ভুল নীতি, মন্ত্রণালয় ও বিজিএমসি'র দুর্নীতির ফল ভোগ করতে হচ্ছে শ্রমিক ও দেশবাসীকে। শ্রমিকদের মজুরি দেয়ার জন্য সরকারি প্রণোদনা নেয়ার পরও প্রায় ছাব্বিশ হাজারের বেশি গার্মেন্ট শ্রমিক ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ব্যাংক, বীমা, প্রাইভেট হাসপাতাল, পরিবহন, হোটেলসহ নানা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত থেকেও লাখ লাখ মানুষ কাজ হারিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়েছে। বিদেশ থেকেও কয়েক লাখ প্রবাসী শ্রমিক কাজ হারিয়ে দেশে ফিরতে শুরু করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকট আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

করোনার এই দুর্যোগের মধ্যেই বন্যার ভয়াবহতা বাড়ছে। বাংলাদেশে বন্যা হয় প্রাকৃতিক কারণে কিন্তু বন্যার দুর্ভোগ বাড়ে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা, ভুল নীতি, দুর্নীতি লুটপাটের কারণে। দেশের শাসকশ্রেণীর রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্যতা, স্বাস্থ্যখাতসহ সর্বত্র চরম অব্যবস্থাপনা, চুরি-চামারী, লুটপাট, ঘুষ, দুর্নীতি, ভোটাধিকার হরণের মহোৎসব। কিন্তু মানুষের কথা বলার ন্যূনতম অধিকার টুকুও নেই।

করোনা, বন্যা, দুর্নীতিকে ছাপিয়ে আর একটি দিক প্রধান হয়ে উঠেছে সরকারের দমন পীড়ন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ত্রাণ চুরির বিরুদ্ধে কথা বললে, পত্র-পত্রিকা কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও অধিকারের কথা বললে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দমন পীড়ন নেমে আসছে। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। করোনায় তা আরও নগ্নভাবে উন্মোচিত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ৯টি হাসপাতালে ৩৭৫ কোটি টাকার দুর্নীতির খবর। খোদ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্তেই এই তথ্য বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দুঃখজনক যে, দুর্নীতিবাজদের কারোই আজ পর্যন্ত শাস্তি হয়নি। দায়ীদের বদলী এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। ফলে দুর্নীতিবাজরা ভীত ও নিরুৎসাহিত না হয়ে আরও উৎসাহিত হয়েছে। সাহেদ-শামীম-পাপিয়ারা সরকার ও সরকারী দলের রাজনীতির নিয়ামক শক্তি রূপে আয়েশেই আছেন।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দুর্নীতির অবাধ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। কক্সবাজারে পুলিশের গুলিতে অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা মেজর সিনহার হত্যা, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনেক সত্য উন্মোচন করছে। সিনহা হত্যার একজন অন্যতম অভিযুক্ত ওসি প্রদীপ কুমার দাশ টেকনাফ থানায় কার্যকালে ১৬১ টি ক্রসফায়ারের ঘটনা ঘটে যাতে ২০০ জন খুন হয়। রাশেদ সিনহা হত্যাকান্ডের পর সেনা ও পুলিশ প্রধানের যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ প্রধান ক্রসফায়ারকে এনজিওদের শব্দ বলেছেন। তিনি একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেছেন। ব্যক্তিকে দায়ী করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় কাদের সুপারিশে প্রদীপকে পুলিশের সাহসিকতার পদকে ভূষিত করা হয়েছিল। ব্যক্তি, ক্ষমতা, পেশা বা পরিচিতি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে।

সরকারিভাবে আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করা না গেলে অবস্থার পরিবর্তন করা একেবারেই অসম্ভব। ২০২০ সালের এপ্রিলে আকস্মিক গার্মেন্ট খুলে দেওয়ার ঘোষণার পর ঢাকা-টাঙ্গাইল এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ঢাকামুখী গার্মেন্ট শ্রমিকদের ঢল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলো যে, তাদের কাছে জীবনের চেয়ে জীবিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে আমরা যতই বলি না কেন, বাস্তবতা অনেক নির্মম। সামাজিক বা শারীরিক দূরত্বের আহ্বান চাপা পড়ে যায় সামান্য বেতনের আশায় ৫০-১০০ কিলোমিটার হেঁটে আসা পোশাক শ্রমিকের দুর্দশার কাছে। প্রয়োজনে এরা স্বাস্থ্যঝুঁকি গ্রহণ করতে দ্বিধা করছে না। জতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি) করোনা মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ অর্থাৎ সাড়ে ছয় কোটি মানুষকে প্রতি মাসে ন্যূনতম পঁচিশ মার্কিন ডলার বা দুই হাজার একশত টাকা নগদ সহায়তা হিসাবে দেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়। সরকার পঞ্চাশ লাখ দরিদ্র মানুষকে আড়াই হাজার করে টাকা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলো। সুবিধাভোগীদের নাম তালিকাভুক্তি করণের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ, দুর্নীতি বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। টাকা পাওয়ার কথা থাকলেও অনেকেই সেই টাকা পায়নি। লকডাউন শুরুর পর থেকে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। যা অনেকটা সিন্ধুতে বিন্দুর মতো। হতদরিদ্র মানুষ কিছুটা পেলেও মধ্যবিত্তের দিকে কেউই নজর দেয়নি। বহু প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মীদের বেতন বন্ধ করে দিয়েছে, অনেককে ছাঁটাই করা হয়েছে। তাই লকডাউনের ঘোষণা আসার পর তারা করোনায় মৃত্যুঝুঁকির চেয়ে জীবিকা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। সত্যিকার অর্থে, ব্যবস্থাপনার জায়গায় লাগবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনের মানবিক মুখ। ত্রাণ আর চাল চুরিতে ব্যস্ত যেসব জনপ্রতিনিধি তারা যদি না থামেন, তাহলে প্রশাসনের উচিত হবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া।

কার্যকর করোনা সংক্রমন সচেতনতা সৃষ্টি করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। লকডাউন, ক্রাকডাউন এবং শাটডাউনের মতো চমকপ্রদ শব্দপ্রয়োগ হলেও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গেছে। শহরের শ্রমজীবী মানুষ ও গ্রামের মানুষের মাঝে করোনা সংক্রমণরোধী স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যাপারে মারাত্মক শিথিলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। জীবিকার প্রয়োজনে করোনা মহাবিপর্যয়কালে অনেক চিকিৎসক রোগীদের সেবা দিতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মাস্ক, পিপিইসহ সুরক্ষা সামগ্রীতে ভয়াবহ দুর্নীতির ফল ভোগ করতে হচ্ছে চিকিৎসক, নার্স, চিকিৎসা কর্মীসহ দেশের জনগণকে। নকল মাস্ক সরবরাহকারী জেএমআই ও দুশ্চরিত্র নেতাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এখনও নেয়া হয়নি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জ্ঞাতসারে ভূয়া করোনা টেস্ট রিপোর্ট দিয়ে রিজেন্ট হাসপাতাল ছয় হাজার পাঁচশ এবং জেকেজি পনের হাজার

দেশে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে। ঠিক এসময়ে সামনে এসে দাঁড়ালো ঈদুল আজহা। এমতাবস্থায় মানুষ জীবন নিয়ে যত উদ্বিগ্ন, এর চেয়ে অনেক বেশি মানুষ জীবিকা নিয়ে উৎকণ্ঠিত। বিশেষ করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ, যাদের আয় উপার্জন দৈনন্দিন কর্মের ওপর নির্ভরশীল তারা জীবিকা নিয়ে মহাদুশ্চিন্তায় পড়েছেন। এই শ্রেণি-পেশার কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তৎপর থাকতে চাইছেন। কেননা সরকারি বেসরকারি চাকরিজীবীরা কমবেশি বেতন পেলেও দোকান কর্মচারীদের ধার-কর্জ করে চলতে হয়েছে। অনেকে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পতিত হয়েছে। তাই তাদের কাছে জীবনের চেয়ে এখন জীবিকার ব্যবস্থা সচল রাখাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আক্রান্ত ব্যক্তিকে প্রতারণা করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলো শুরুতে করোনা মহামারী মোকাবিলায় এগিয়ে আসেনি। এখন তাদের বড় একটি অংশ চিকিৎসার নামে অতিরিক্ত বিলের মাধ্যমে মানুষকে সর্বস্বান্ত করছে। করোনার এই সংকটকালে বেঁচে থাকতে হলে সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। অফিস-আদালত, কাঁচা বাজার থেকে শুরু করে, ওষুধের দোকান, ঘরে-বাইরে সর্বত্র আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে। দেশের করোনাকালীন সংকট পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে কতগুলো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার, যা জীবন ও জীবিকার মধ্যে সমন্বয় সধন করবে। **প্রথমত:** চলমান মহামারি প্রতিরোধ ও কভিড চিকিৎসা দুটিই সমানতালে চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাস্থ্য খাতে সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্রের সর্বশক্তি দিয়ে এই কাজটি করতে হবে। টিকা দেওয়া, কঠোর স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার ব্যবস্থা করতে হবে। **দ্বিতীয়ত:** চাল, ডাল, তেল, চিনিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের সরবরাহটা স্বাভাবিক রাখতে হবে। এ জন্য সব সময়ই যেন এসব পণ্যের মজুদ স্বাভাবিক থাকে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কৃষি খাতে ভর্তুকি, প্রণোদনাসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উৎপাদন বাড়াতে হবে। **তৃতীয়ত:** ছোট ছোট ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাটগুলোকে টিকিয়ে রাখতে অর্থায়ন প্রয়োজন। ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের হাতে যেন প্রণোদনার অর্থ পৌঁছে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে ব্যাংকগুলোকে বাধ্য করতে হবে। এ ধরনের প্রণোদনা রিলিফের চেয়ে অনেক ভালো। **চতুর্থত:** সামাজিক সুরক্ষা বৃদ্ধি করতে হবে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, সহানুভূতি, সামাজিক সংহতি, সহযোগিতা, সম্প্রীতি, আস্থা, বিশ্বাস, মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা, মূল্যবোধ তৈরিসহ নানা প্রয়োজনে মসজিদ-মন্দিরসহ ধর্মীয় এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কাজ করার স্বাধীনতা দিতে হবে। **পঞ্চমত:** আল্লাহ ভয় এবং জবাবদিহীতার অনুভূতি নিয়ে জনগণের মানবিক মৌলিক অধিকারসমূহ ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। **ষষ্ঠত:** করোনার কারণে আমদানি ব্যয় কমে গেছে। আবার রপ্তানি আয়ও কম। তবে প্রবাসী আয় আসছে, সঙ্গে ঋণ ও অনুদানও। এ কারণে রিজার্ভ বাড়ছে। রিজার্ভের এ বৃদ্ধিসূচক খুব একটা সুখকর নয়। দেশের অর্থনীতি সচল করতে আমদানি বাড়াতেই হবে।

পরিশেষে বলা যায়, দেশে করোনা সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে। ঠিক এসময়ে সামনে এসে দাঁড়ালো ঈদুল আজহা। এমতাবস্থায় মানুষ জীবন নিয়ে যত উদ্বিগ্ন, এর চেয়ে অনেক বেশি মানুষ জীবিকা নিয়ে উৎকণ্ঠিত। বিশেষ করে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণির পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষ, যাদের আয়-উপার্জন দৈনন্দিন কর্মের ওপর নির্ভরশীল তারা জীবিকা নিয়ে মহাদুশ্চিন্তায় পড়েছেন। এই শ্রেণি-পেশার কোটি কোটি মানুষ মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তৎপর থাকতে চাইছেন। কেননা সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবীরা কমবেশি বেতন পেলেও দোকান কর্মচারীদের ধার-কর্জ করে চলতে হয়েছে। অনেকে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় পতিত হয়েছে। তাই তাদের কাছে জীবনের চেয়ে এখন জীবিকার ব্যবস্থা সচল রাখাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের যুক্তি, করোনাভাইরাসে ২০-২২ শতাংশ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে, যা বেড়ে ৩০ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। এতে তাদের মত নিম্ন-মধ্যবিত্ত মানুষের হার ১০ থেকে বড়জোর ১৫ শতাংশ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এর ১ থেকে দেড় শতাংশ মানুষ মারা যেতে পারে। অথচ তাদের জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে গেলে এই শ্রেণির অনেক বেশি মানুষকে জীবিত থেকেও 'মৃত্যুমুখে' পড়তে হবে। তাই তাদের বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করা দরকার। পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে বিশেষ প্রণোদনাসহ জীবনঘনিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ এখন সময়ের দাবী।

লেখক: কবি ও গবেষক, প্রফেসর
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রমিক সংগঠন পরিচালনা ও গতিশীলতা আনয়নে দায়িত্বশীলদের ভূমিকা

আতিকুর রহমান

■ **শ্রমিক সংগঠন কি?**

১. শ্রমিকের দাবী-দাওয়া ও অধিকার নিয়ে যে সংগঠন কাজ করে তাকেই শ্রমিক সংগঠন বলা হয়।

২. শ্রমিক সংগঠন বলতে মূলতঃ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে বোঝায়। শ্রমজীবি মানুষের অধিকার আদায়ে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

■ **শ্রমিক সংগঠনের গুরুত্ব:**

১. জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র ২৩-২৫ ধারা, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদে, আইএলও কনভেনশন ৮৭,৯৮ ও বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ১৭৫ ২০৮ ধারা শ্রমিকদের সংগঠন করা/ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. শ্রমজীবি মানুষ তুলনামূলকভাবে অসহায় হলেও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে বড় শক্তিতে পরিণত হয়।

৩. শ্রমজীবি, দুর্বল, অসহায় নর-নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই সংগ্রাম করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে সূরা নিসার-৭৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন, "তোমাদের কী হলো, তোমরা আল্লাহর পথে অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য লড়বে না, যারা দুর্বলতার জন্য নির্যাতিত হচ্ছে? তারা ফরিয়াদ করছে হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য কোনো বন্ধু, অভিভাবক ও সাহায্যকারী তৈরী করে দাও"। কাজেই শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম থেকে রক্ষা করার জন্য শ্রমিকদেরকে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করার বিকল্প নেই।

৪. শ্রমিকদের সংগঠিত করে বিগত শতাব্দিতে চীন, রাশিয়াসহ সারা পৃথিবীর ৩০টিরও বেশি দেশে কমিউনিষ্ট বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। কমিউনিষ্ট বিপ্লবের মূল শক্তি ছিলো শ্রমজীবী মানুষ। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অত্যাচারী জার সম্রাটের বিরুদ্ধে লেলিনের নেতৃত্বে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও, শ্রমিকরাজ কায়েম করো' এ শ্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে শ্রমিকরা সর্বহারার রাজ তথা শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠা করে। আবার ঐ রাশিয়ায় ১৯৯০ সালে সমাজতন্ত্রের পতনের আন্দোলনে লেলিনবাদে শ্রমিকরা ট্যাঙ্কের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ১৯৪৯ সালে চীনের কৃষি শ্রমিকরা 'লাঙ্গল যার জমিন তার' শ্লোগানে উজ্জিবীত হয়ে কমরেড মাওসেতুং এর নেতৃত্বে চিয়াং কাইশেককে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করে। ১৭৭৬ সালে 'সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার' ফরাসী বিপ্লবে বাস্তিল দুর্গ পতনে শ্রমিকরা অগ্রনী ভুমিকা পালন করে। সুতরাং শ্রমিকদেরকে সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করতে পারলে যেকোনো আদর্শকে সহজে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

৫. শ্রমিক সংগঠনগুলোর মূল শক্তি হলো ট্রেড ইউনিয়ন। ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া শ্রমিক সংগঠনগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে এবং সরকার ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও এর কোন গুরুত্ব থাকে না।

৬. বাংলাদেশের পরিবহন ও গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন পেশার শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে যতবারই দাবী আদায়ের জন্য মাঠে নেমেছে তারা সফলতা পেয়েছে।

৭. বাংলাদেশের সংবিধানে ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগনের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা। ১৫(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে নাগরিকের জন্য অন্য, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। যদিও সাংবিধানিক এ অধিকার থেকে দেশের বৃহৎ শ্রমিক জনগোষ্ঠী আজ বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় শ্রমিকদের সামগ্রিক অধিকার আদায়ে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার বিকল্প নাই।

■ **আমাদের শ্রমিক সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:**

১. ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান করে শ্রমজীবী মানুষের সত্যিকার মুক্তি সাধন করা।

২. ইসলামে শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শ্রমিকদেরকে সম্পৃক্ত করার

লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম জোরদার করা।

৩. কল্যাণমুলক ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য শ্রমিক ময়দানকে প্রস্তুত করা। এই লক্ষ্যে শ্রমিক জনগোষ্ঠীকে ইসলামী জীবন বিধান পুরোপুরি পালনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো।

৪. শ্রমিক ময়দানে ইসলামী আদর্শের প্রভাব সৃষ্টি করা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে ইসলাম ও ইসলামী মুল্যবোধ শেখার পাঠশালা হিসেবে পরিণত করা।

৫. শ্রম সেক্টরে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

৬. মজলুম মানুষের অধিকার রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করা এবং সকল প্রকার জুলুমের অবসান ঘটিয়ে সুবিচার নিশ্চিত করা।

৭. শ্রেণি সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণি সমঝোতা এবং বৈধ ও ন্যায় সংগত অধিকার আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

৮. প্রচলিত ট্রেড ইউনিয়নের ধারা পরিবর্তন করে নতুন কল্যাণমূলক ধারার সূচনা করা।

শ্রমিক সংগঠন পরিচালনায় দায়িত্বশীলদের ভূমিকা

■ **পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা :**

সময়োপযোগী ও ময়দানের বাস্তব অবস্থার আলোকে ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। একটি বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে দায়িত্বশীলদের নিম্লোক্ত বিষয়াবলীকে সামনে রাখতে হবে।

- সংশ্লিষ্ট শাখায় মোট শ্রমিক সংখ্যা কত?
- পেশাভিত্তিক সম্ভাব্য শ্রমিক সংখ্যা কত?
- প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক সংখ্যা কত?
- মোট নারী শ্রমিক কত?
- ফ্যাক্টরী/মিল কল-কারখানার সংখ্যা কতটি?
- কর্মহীন শ্রমিক কতজন?
- পেশাভিত্তিক জনশক্তির শ্রেণীবিন্যাস করা।
- অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের তৎপরতা জানা।
- অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা/আর্থিক সক্ষমতার দিক বিবেচনায় রাখা ।

■ **পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভূমিকা :**

১. পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ।
(ত্রৈ-মাসিক /ষান্মাসিক/বার্ষিক)

২. গৃহীত পরিকল্পনা সকল জনশক্তির মাঝে বন্টন করে দেওয়া। এক্ষেত্রে জনশক্তির মান, অবস্থান ও ঝোঁক প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৩. দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে বন্টনকৃত কাজের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যালোচনা করা।

৪. নিয়মিত তত্ত্বাবধান ও মনিটরিং করা।

৫. অধঃস্তন পর্যায়ের সকল সংগঠন (উপজেলা/থানা/পৌরসভা/ ইউনিয়ন/ওয়ার্ড/ইউনিট/ট্রেড ইউনিয়ন) থেকে নিয়মিত রিপোর্ট সংগ্রহ নিশ্চিত করা এবং পরিকল্পনার আলোকে কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা ও জবাবদীহিতা নেওয়া।

৬. দায়িত্বশীলসহ সর্বস্তরের জনশক্তিকে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত থাকা।

■ **দাওয়াত সম্প্রসারণে ভূমিকা :**

১. জনশক্তিকে দাওয়াতী কাজের অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা।

২. জনশক্তির ব্যক্তিগত ও টার্গেটভিত্তিক দাওয়াতী কাজ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে প্রত্যেক জনশক্তির (সদস্য + কর্মী +সক্রিয় সমর্থক) ব্যক্তিগতভাবে প্রতিমাসে ৩ জন করে বছরে ৩৬ জন শ্রমিকের নিকট ইসলামী আদর্শে দাওয়াত পৌঁছানো এবং প্রতি মাসে ২টি করে বছরে কমপক্ষে ২৪টি বই বিলি ও ১২টি বই বিক্রির বিষয় তত্ত্বাবধান করা।

৩. গ্রুপ ভিত্তিক বিভিন্ন শিল্প কল-কারখানা, শিল্পাঞ্চল, গ্যারেজ, ষ্ট্যান্ড ও শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকায় দাওয়াতী তৎপরতা চালানো এবং দাওয়াতী ইউনিট গঠন করা।

৪. সকল পেশা/ট্রেডে সংগঠনের কাজকে জালের মতো ছড়িয়ে দেয়া এবং প্রতিটি পেশায় পেশাভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে দাওয়াতী তৎপরতা পরিচালনা করা।

৫. পরিকল্পিতভাবে সেবামুলক কার্যক্রম তথা স্বাস্থ্যসেবা, আত্মকর্মসংস্থান, শিক্ষা সহায়তা, দুর্যোগ-দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের সেবা ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নমুলক কার্যক্রম পালনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষকে দাওয়াতী বলয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬. দাওয়াত সম্প্রসারনে ব্যাপক শ্রমিকবান্ধব ও কল্যাণমুলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৭. প্রভাবশালী ও নেতৃত্বের গুনাবলী সম্পন্ন শ্রমিকদের মাঝে টার্গেট ভিত্তিক কাজ করা।

৮. নারী শ্রমিকদের দাওয়াতের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে শিল্প সেক্টরসহ নারী শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া।

৯. ইসলামী শ্রমনীতির উপর সেমিনার-সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা এবং ইসলামী শ্রমনীতি প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখা।

১০. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ই-মেইল, ফেসবুক, ব্লগ, টুইটার ইত্যাদির মাধ্যমে দাওয়াতী তৎপরতা পরিচালনা করা।

১১. শ্রমজীবি মানুষের সাথে সম্পর্কিত শর্টফ্লিম, নাটক, গান, দাওয়াতী সিডি-ভিসিডি প্রকাশ ও অনলাইনে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা।

১২. শ্রমিক আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বই, পত্রিকা ও দাওয়াতী উপকরণ বিশেষ করে নববর্ষের ক্যালেন্ডার, ডায়েরী ও স্টীকার ব্যাপক হারে বিতরণের পদক্ষেপ নেওয়া।

১৩. আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসসহ গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালনের মাধ্যমে শ্রমিকদের মাঝে দাওয়াতী প্রভাব বলয় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া।

১৪. বিশেষ দাওয়াতী সপ্তাহ/দশক/ পক্ষ পালন করা।

১৫. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও শিক্ষা সফরসহ বিনোদনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

১৬. কুরআন শিক্ষার আসর, নামাজ শিক্ষার ক্লাসের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করা।

১৭. অন্যান্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচিত হওয়া, ফেডারেশনের দাওয়াতী সামগ্রী পৌছানো ও সম্পর্ক তৈরীর চেষ্টা করা।

■ **সংগঠন সম্প্রসারণে ভূমিকা:**

১. সকল পেশা/ ট্রেডে সংগঠনের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. প্রত্যেক পেশাভিত্তিক কমিটি গঠন/দাওয়াতী ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা।

৩. প্রশাসনিক সর্বস্তরে কমপক্ষে ইউনিট গঠনের মাধ্যমে সংগঠনকে সম্প্রসারন করা।

৪. যে সকল ওয়ার্ড/ইউনিয়নে সংগঠন নেই সেসকল স্থানে সংগঠন কায়েম করা।

৫. সাধারণ শ্রমিকদের নিকট ফেডারেশনকে ব্যাপক পরিচিত করার উদ্যোগ নেওয়া।

৬. নতুন নতুন ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া।

৭. সকল পেশার শ্রমজীবী মানুষের নিকট দাওয়াত পৌছানোর লক্ষ্যে পরিকল্পিত তৎপরতা চালানো।

৮. সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে প্রভাব সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া।

■ সংগঠন মজবুতি করণে ভূমিকা

১. সংগঠনের বর্তমান অবস্থাকে সামনে রেখে মজবুতি অর্জনের স্বল্পমেয়াদী কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী টার্গেট নির্ধারণ করা।

২. ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে সক্রিয়, গতিশীল ও শ্রমিক বান্ধব করা।

৩. গুরুত্বপূর্ণ পেশা সমূহের শক্তিশালী কমিটি গঠন করা এবং পরিকল্পিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪. প্রশাসনিক সকল স্তরে শক্তিশালী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা। শতভাগ থানা/উপজেলায়/পৌরসভায় মজবুত সংগঠন কায়েম করার উদ্যোগ নেওয়া।

৫. ইউনিটগুলোকে সক্রিয় রাখা ও নিয়মিত মৌলিক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা।

৬. সকল জনশক্তিকে সক্রিয় রাখা এবং নিয়মিত যোগাযোগের আওতায় রাখা।

৭. অধঃস্তন সংগঠনে পরিকল্পিত সফর বৃদ্ধি করা।

■ সেক্টর/পেশা ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনায় ভূমিকাঃ

১. প্রত্যেক পেশায় কার্যক্রম মজবুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. প্রত্যেক মহানগরী, জেলা, উপজেলা ও থানা পর্যায়ে প্রত্যেক পেশাভিত্তিক সক্রিয় কমিটি গঠন করা। এক্ষেত্রে 'যত পেশা ততো কমিটি' এ শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং তৃনমূল পর্যায়ে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া।

৩. প্রত্যেক জনশক্তিকে পর্যায়ক্রমে সেক্টর/পেশা ভিত্তিক কাজে নিয়োজিত/বন্টন করা।

৪. প্রত্যেক জনশক্তিকে নির্দিষ্ট পেশা ও কাজের টার্গেট ঠিক করে দেওয়া। এ ক্ষেত্রে জনশক্তি যে পেশার সাথে সম্পৃক্ত তাকে সে পেশায় কাজে লাগানো।

৫. সেক্টর/পেশা ভিত্তিক ইউনিট বৃদ্ধি ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ভূমিকা রাখা।

৬. সেক্টর ভিত্তিক শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা।

৭. স্ব-স্ব সেক্টরের শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে মাঠ পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া।

৮. মাসিক ও বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে সেক্টরের নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৯. সেক্টর দায়িত্বশীলদের নিয়ে মাসিক/দ্বি-মাসিক রিপোর্টিং বৈঠকের আয়োজন করা।

■ ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে/সম্প্রসারণে ভূমিকাঃ

১. পরিকল্পিতভাবে প্রত্যেক উপজেলায়/থানায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া।

২. প্রতিটি পেশায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের পদক্ষেপ নেওয়া। এক্ষেত্রে 'যত পেশা ততো ইউনিয়ন' এই শ্লোগানকে ধারন করে ট্রেড ইউনিয়ন সম্প্রসারনে ভূমিকা রাখা।

৩. তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম বিস্তৃত করন। অর্থাৎ ট্রেড ভিত্তিক শিল্প কল-কারখানায়, গ্যারেজ, স্ট্যান্ড, প্রতিষ্ঠান, সংস্থার মাঝে ট্রেড ইউনিয়ন কাজের বিস্তৃতি ঘটানো।

■ ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের মজবুতি অর্জনে ভূমিকাঃ

১. শাখার আওতাধীন সকল ট্রেড ইউনিয়নকে সাংগঠনিক ইউনিট, ওয়ার্ড ও থানা মানে নিয়ে আসার পাশাপাশি মাসিক নিয়মিত রিপোর্টিং ও জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা ।

২. প্রকাশ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের কার্যক্রম পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে ইউনিয়নের সদস্যদের আইডি কার্ড প্রদান, নিয়মিত মাসিক চাঁদা আদায় এবং নেতৃবৃন্দের নিয়মিত অফিসে সময়দান ও শ্রমিক সাক্ষাৎ নিশ্চিত করা।

৩. শ্রম আইনের নির্দেশনা মোতাবেক ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৪. ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাংগঠনিক ও নৈতিক মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো।

৫. শ্রমিক স্বার্থমূলক ইস্যুতে শ্রমিকদেরকে সম্পৃক্ত করে ইউনিয়নের ব্যানারে দাবী আদায়ে মূখ্য ভূমিকা পালন করা। এক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ, স্বারকলিপি ও মানববন্ধনের আয়োজন করা।

৬. ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের নিয়মিত দাওয়াতী তৎপরতা চালানো এবং ইউনিয়নের নতুন সদস্য বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা।

৭. প্রত্যেক ইউনিয়নের Chain of Leadership ঠিক রাখা। এক্ষেত্রে ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সংগঠনের সদস্য মানে উন্নীত করার উদ্যোগ নেওয়া।

৮. ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের শ্রম আইন সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

৯. শ্রমিক সেবামুলক কাজের মাধ্যমে সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে ইউনিয়নের প্রভাব বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া।

১০. প্রভাবশালী ও নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন শ্রমিকদেরকে ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত করা।

১১. শ্রমিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রামে ভূমিকা রাখা।

১২. ট্রেড ইউনিয়নের উদ্যোগে শ্রমিক বান্ধব ও কল্যাণমুলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।

১৩. মাসিক ও বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১৪. ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিয়ে বছরে কমপক্ষে এক বার শাখার উদ্দ্যোগে "ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলন" এর আয়োজন করা।

১৫. প্রতিবছর ৩০ এপ্রিলের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের রিটার্ণ দাখিল করা

১৬. প্রতিমাসে কিংবা দু'মাস অন্তর ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের নিয়ে রিপোর্টিং বৈঠকের আয়োজন করা এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা।

■ কাঙ্খিত শ্রমিক নেতৃত্ব তৈরীতে ভূমিকাঃ

১. সাহসী ও নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন শ্রমিক জনশক্তি বাছাই করা।

২. বাছাইকৃত জনশক্তিকে নিয়মিত সাহচর্য প্রদান করা।

৩. নিয়মিত পাঠচক্র পরিচালনা করা।

৪. শ্রম আইন, ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক ময়দান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৫. ত্রুটি দুরীকরণ, সংশোধন ও পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা।

৬. মেজাজ, আচার-আচরণ, আমল-আখলাক, লেন-দেন ও নৈতিক মান সংক্রান্ত খোঁজ-খবর রাখা।

৭. আদর্শিক জ্ঞানের ঘাটতি দূরীকরণের উদ্যোগ নেওয়া।

৮. সংগঠনের নিয়ম শৃঙ্খলা পালনে অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা।

৯. আনুগত্য পরায়ণ এবং সংগঠনের মেজাজ অনুযায়ী গড়ে তোলা।

১০. নিয়মিত দাওয়াতী কাজে অভ্যস্ত করানো।

১১. আন্দোলনের জন্য যে কোনো ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা তৈরী করা।

১২. কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রম প্রিয় করে গড়ে তোলা।

১৩. শ্রমিক ময়দানে কাজে দক্ষ করে গড়ে তোলার কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে দর কষাকষি করার যোগ্যতা এবং মালিক ও প্রশাসনের সাথে কথা বলার যোগ্যতা তৈরী করা।

১৪. ছাত্র সংগঠনের সাবেক নেতা-কর্মীদের শ্রমিক ময়দানে নেতৃত্বের জন্য বাছাই করা।

১৫. গণমুখী চরিত্র সম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরী করা।

১৬. আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া এবং নাম ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করা।

■ জনশক্তির সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা:

১. "শ্রমিক সংগঠনের কর্মী মানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কর্মী" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে সর্বস্তরে শ্রমিক জনশক্তির ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কার্যক্রম সংক্রান্ত দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

২. শ্রম আইন, শ্রম বিষয়ক জ্ঞান ও ইসলামী শ্রমনীতি বিষয়ক সম্যক ধারনা প্রদান করা।

৩. পেশাভিত্তিক জনশক্তিকে বাছাই করে সংশ্লিষ্ট পেশায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

৪. ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৫. প্রশিক্ষন প্রোগ্রামগুলোকে শ্রমিক বান্ধব ও আকর্ষণীয় করা।

■ আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা:

১. আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিয়মিত ব্যয় নির্বাহকল্পে অর্থ বিভাগের আয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেওয়া।

২. সকল জনশক্তির মাসিক নেসাব নিয়মিত আদায়ের ব্যবস্থা করা।

৩. সকল নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের উর্ধ্বতন মাসিক চাঁদা নির্ধারণ ও নিয়মিত আদায়ের ব্যবস্থা করা।

৪. উপদেষ্টা সংগঠন থেকে মাসিক নিয়মিত সহযোগিতা পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

৫. শুভাকাঙ্খী বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া।

■ সংগঠনের ইমেজ বৃদ্ধিতে ভূমিকা:

১. শ্রমিকদের বিপদে আপদে পাশে থাকা। সাধ্যমত সহযোগিতা করা।

২. ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে ব্যাপক সেবামুলক কার্যক্রম চালু করা।

৩. শ্রমিকদের যৌক্তিক দাবী আদায়ের আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেওয়া।

৪. জনশক্তির মধ্যে মানুষের কল্যাণে সময়, শ্রম ও আর্থিক কোরবানী পেশ করার মানসিকতা তৈরী করা।

৫. শ্রমঘন এলাকায় এবং ফ্যাক্টরীতে মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করে চিকিৎসা সেবা প্রদান, ঔষধ বিতরণ ও ব্লাড গ্রুপিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬. চাকুরীচ্যুত শ্রমিকদের আইনী সহযোগিতা প্রদান এবং কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেওয়া।

৭. শ্রমিক পরিবারে মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে সাধ্যনুযায়ী সহযোগিতা প্রদান করা।

৮. বেকার শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং কর্ম-অক্ষম শ্রমিকদের সহযোগিতা প্রদান করা।

৯. শিশু শ্রম বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া।

■ মহিলা শ্রমিকদের মাঝে কাজ সৃষ্টিতে ভূমিকা:

১. শ্রমজীবী মহিলাদের মাঝে সংগঠনের কাজকে বিস্তৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

২. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গার্মেন্টস, দর্জি, গৃহকর্মী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, তাঁত শিল্প ও চাতাল শ্রমিকদের মাঝে কাজ সৃষ্টির পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

■ জনশক্তির মানোন্নয়ন ও মান সংরক্ষনে ভূমিকা:

১. নিয়মিত সদস্য, কর্মী ও সাধারণ সদস্য বৃদ্ধি করা।

২. জনশক্তির ব্যক্তিগত উদ্যোগে সদস্য ও কর্মী বৃদ্ধির টার্গেট বাস্তবায়নে তদারকি বৃদ্ধি করা।

৩. অগ্রসর জনশক্তিকে বাছাই করে মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষন প্রদান করা।

৪. ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সাহচার্য্য প্রদান করা।

৫. জ্ঞানের ঘাটতি দুর করা।

৬. নৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিশুদ্ধতা অর্জনে ভূমিকা রাখা।

৭. আমল আখলাক ও মুয়ামেলাতের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত মান অর্জনে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করা।

৮. মানসম্মত ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষন প্রদান করা।

৯. পেশাভিত্তিক নেতৃত্ব তৈরীতে উপযোগী জনশক্তিকে বিশেষ টার্গেট নিয়ে মানোন্নয়ন করা।

১০. নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ভাবে নফল ইবাদতের অভ্যাস গড়ে তোলা।

■ গতিশীলতা আনয়নে ভূমিকা:

১. জনশক্তিদের মধ্যে Team Speed সৃষ্টি করা।

২. পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালানো।

৩. সর্বপর্যায়ে আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশ তৈরী করা।

৪. পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা।

৫. পরামর্শ ভিত্তিক কাজ করা এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

৬. জনশক্তির মাঝে ইনসাফ কায়েম করা।

৭. সর্বপর্যায়ে চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলা।

৮. অপরের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া।

৯. মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করা।

১০. দায়িত্বশীলদের যোগ্যতার সকল কিছু উজাড় করে দিয়ে ভূমিকা রাখা। সর্বোপরি সংগঠন পরিচালনায় মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট সর্বদা সাহায্য প্রার্থনা করা একজন দায়িত্বশীলের প্রধানতম কর্তব্য। মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের সকল প্রকার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতাকে দুরীভূত করে শ্রমিক ময়দানে আমাদের উপর অর্পিত দ্বীনি আন্দোলনের মহান জিম্মাদারী সঠিকভাবে পালন করার তাওফিক দিন। ইসলামী শ্রমনীতি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে সফল করে শ্রমজীবী মানুষের সত্যিকার মুক্তি অর্জনের পথকে সুগম করে দিন। আমিন

লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

শাহ আব্দুল হান্নান চাচা

অনুপ্রেরণাদায়ক কিছু স্মৃতি ও কিছু কথা

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

আমি ১৯৮০ এর দশকে ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা বইটি যখন পড়ি তখন শাহ আব্দুল হান্নান-কে (১৯৩৯-২০২১) জানতাম একজন অর্থনীতিবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক ও বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদস্থ একজন আমলা হিসাবে। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ হয় ১৯৯৬ সালে। তখন আমি ঢাকায় কলাবাগান থাকতাম। তারপর থেকেই তাঁকে চাচা ডাকি। ২০০০ সালে আমি লন্ডন আসার পর যতবারই দেশে গিয়েছি প্রায়ই চাচার সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটানোর চেষ্টা করতাম। চাচা যুক্তরাজ্যে বসবাসরত তাঁর চেনা-জানা লোকজনদের খোঁজখবর নিতেন আর দাওয়াহ কাজের অবস্থা জানতেন। আর আমিও বাংলাদেশসহ মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন বিষয়ে চাচার মতামত জানার চেষ্টা করতাম এবং নোট করতাম। মাঝে মধ্যে ইমেইলে চাচার সাথে যোগাযোগ হতো। মূলত ইমেইলে দাওয়াহ কাজ ও যোগাযোগে চাচা ছিলেন অনন্য।

চাচা ছিলেন আমার অভিভাবক, মেন্টর,গাইড ও অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি বিভিন্ন অর্থ-সামাজিক, একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ১২/১০/২০০৬ 'ফাউন্ডেশন ফর ইসলামিক নলেজ এন্ড রিসার্চ' (ফিকর) গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বাংলাদেশ ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন মিলনায়তনে 'ইসলামী গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থার সমস্যা ও সম্ভাবনা' শিরোনামে একটি কর্মশালা এবং 'ইসলামের প্রচার ও প্রসারে গবেষণা ও প্রকাশনা সংস্থার ভূমিকা' শীর্ষক একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কবি আল মাহমুদ এবং চাচা উক্ত প্রোগ্রামে অতিথি ছিলেন। চাচা গুরুত্ব দিয়ে বলেন, " এ যুগ হচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে যেসব দেশ নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে সবার চেয়ে এগিয়ে। সে সব দেশে সামাজিক সমস্যা ব্যাপক এবং নৈতিকতার মারাত্মক বিপর্যয়ের সন্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও কেবল জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রসর হওয়া এবং উচ্চতর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কারণে বিশ্বের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমাদের জন্য পাশ্চাত্যের মূল চ্যলেঞ্জ হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক। তারা প্রশ্ন তুলছে যে ইসলামে মানবাধিকার নেই। নারীর অধিকার বিপন্ন। সেক্যুলার ব্যবস্থা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। এসব অসংখ্য প্রশ্নের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং একাডেমিক জবাব দিতে হবে। মুসলিম বিশ্বের সামনে অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে অসংখ্য যোগ্য লোক বিশেষ করে intelectual তৈরী করা। আমাদের জন্য উসওয়ায়ে হাসানাহ হচ্ছেন আখেরী নবী সাইয়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মদ (সা)। আমরা শাহ আব্দুল হান্নান সাহেব এর জীবনী আলোচনা করছি এইজন্য যে, আল্লাহর রাসুল (সা) বলেছেন, উযকুরু মাহাসিনা আমওয়াতিকুম' তোমরা তোমাদের মৃতদের ভালো দিকগুলো আলোচনা করা। কারো মুত্যুর পর তার ভালো বা মন্দ কাজের স্বতঃস্ফুর্ত সাক্ষী দিয়ে মানুষ ভাল বা মন্দ যে মন্তব্য করে আল্লাহর ফেরেশতারা তা রেকর্ড করে। আল্লাহ তায়ালা তা শোনেন। শাহ আব্দুল হান্নান চাচার মৃত্যুর পর দলমত নির্বিশেষে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেভাবে দুআ হচ্ছে এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়? তিনি জীবিত অবস্থায় হৃদয় দিয়ে সকল স্তরের মানুষকে ভালবাসতেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁকে অসংখ্য মানুষ কত বেশী ভালবাসে? মানুষের এই ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এই কথাই প্রমান করে যে , তিনি আল্লাহর মাহবুব বান্দাহদের একজন। তাই তাঁর জীবন থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় দিকগুলো আলোচনা করা গুরুত্বের দাবীদার। কারণ আজকের পৃথিবীতে ৮ বিলিয়ন এর মতো মানুষ আছে। কিন্তু আদর্শ মানুষ কতজন আছে ? সমাজে আদর্শ মানুষের বড় অভাব। উন্নত চিন্তার অধিকারী মহৎ মানুষের অভাবেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছেনা। যারা আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদেরকে শুধু সৎ হলে চলবেনা। সততার সাথে যোগ্যতা ও দক্ষতার সমন্বয় থাকতে হবে। আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে শাহ আব্দুল হান্নানের মতো সৎ, যোগ্য, দক্ষ, বহু-মূখী মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মহত মানুষ হতে হবে।

আমরা আসহাবে রাসুল দেখিনি। তাবেঈ-তাবেঈ তাবেঈন দেখিনি। কিন্তু তাঁদের জীবনী পড়েছি। শাহ আব্দুল হান্নান এর সততা, অনাড়ম্বর জীবন যাপন, আমানতদারীতা, উদারতা, মহানুভবতা, সময় ব্যবস্থাপ-না, সঠিক কথা স্পষ্টভাষায় বলা, আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা, কথা ও কাজের মিল থাকা, মুআমেলাত ও কুরআন-সুন্নাহর সঠিক বুঝ এবং তার প্রচারে সার্বক্ষনিক প্রচেষ্টাসহ নানাবিধ গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে এই কথা আমার হৃদয় সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাঁর চরিত্রে আসহাবে রাসুলের বাস্তব

আজকের পৃথিবীতে ৮ বিলিয়ন এর মতো মানুষ আছে। কিন্তু আদর্শ মানুষ কতজন আছে ? সমাজে আদর্শ মানুষের বড় অভাব। উন্নত চিন্তার অধিকারী মহৎ মানুষের অভাবেই আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছেনা। যারা আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদেরকে শুধু সৎ হলে চলবেনা। সততার সাথে যোগ্যতা ও দক্ষতার সমন্বয় থাকতে হবে। আদর্শ সমাজ গঠন করতে হলে শাহ আব্দুল হান্নানের মতো সৎ, যোগ্য, দক্ষ, বহু-মূখী মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মহত মানুষ হতে হবে। আমরা আসহাবে রাসুল দেখিনি। তাবেঈ-তাবেঈ তাবেঈীন দেখিনি। কিন্তু তাঁদের জীবনী পড়েছি। শাহ আব্দুল হান্নান এর সততা, অনাড়ম্বর জীবন যাপন, আমানতদারীতা, উদারতা, মহানুভবতা, সময় ব্যবস্থাপনা, সঠিক কথা স্পষ্টভাষায় বলা, আদর্শের প্রতি দৃঢ়তা, কথা ও কাজের মিল থাকা, মুআমেলাত ও কুরআন-সুন্নাহর সঠিক বুঝ এবং তার প্রচারে সার্বক্ষনিক প্রচেষ্টাসহ নানাবিধ গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য করলে এই কথা আমার হৃদয় সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তাঁর চরিত্রে আসহাবে রাসুলের বাস্তব অনুসরণের অনেক নমুনা পাওয়া যায়।

অনুসরণের অনেক নমুনা পাওয়া যায়। যা বর্তমান সময়ে অনেক জ্ঞানী-গুণীদের জীবনে দেখা যায়না। অনেক গুণী মানুষের কাছে গেলে তার প্রতি পোষণ করা শ্রদ্ধায় ভাটা পড়ে। কিন্তু চাচা ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর কাছে গেলে আরও কাছে যেতে মন চাইতো। প্রতিবারই দেখা হলে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতো "ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ক্লাসে যেমন প্রতিনিয়ত নতুন নতুন চিন্তার খোরাক পাওয়া যেতো, চাচার সাথে আলাপ -আলোচনায় সব সময় নতুন কিছু চিন্তার খোরাক মিলতো। তিনি সব সময় উপদেশ দিতেন, আমাদেরকে অধিক পড়াশুনা, অধিক লেখা এবং অধিক দাওয়াতের কাজ করতে হবে"

চাচা বাংলাদেশ সরকারের সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্ণর এর মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন শেষে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান, মানারাত বিশ্ববিদ্যালয় ও ইবনে সীনার ট্রাস্টিবোর্ডের চেয়ারম্যানসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যেও তিনি অসংখ্য মানুষকে ব্যক্তিগত সাহচার্য্য দিয়েছেন। আমার ভাবতে অবাক লাগে আমার মতো একজন নগন্য ব্যক্তির কয়েকটি বই তিনি সম্পাদনার সময় পেলেন কি করে? সমাজ সংগঠন ইসলামী দৃষ্টিভংগী, ভারসাম্যপূর্ণজীবন ও সময় ব্যবস্থাপনা বইতে তিনি অভিমত লিখেছেন। ক্যরিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন মুসলিম যুব সমাজের সময়ের দাবী, মানুষের শেষ ঠিকানা ও সাইয়েদ কুতুব জীবন ও কর্মসহ বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করে বলতেন , " চাচ্চু তোমাকে কারজাভী হতে হবে"। যদিও তাঁর আশে পাশে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু চাচার দেয়া ভিশন, উৎসাহ, মোটিভেশন, বাস্তব গাইডলাইন আমার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছে। তিনি আমার দেখা ভালো মানুষদের মাঝে অন্যতম সেরা ভালো মানুষ। আমার দৃষ্টিতে তিনি প্রচলিত অর্থে নেতা ছিলেন না বরং অনেক নেতার মেন্টর ছিলেন। তাঁর কোনো পিএইচডি ডিগ্রি ছিলনা। কিন্তু অসংখ্য পিএইচডি ডিগ্রীধারীর তিনি বাস্তব গাইড ছিলেন। আমি মনে করি তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক ও চিন্তাধারা নিয়ে পিএইচডি গবেষণাসহ রিসার্চ হওয়া দরকার। তিনি কুরআন- সুন্নাহর টেক্সট বর্তমান কনটেক্সট এর আলোকে বুঝতে এবং প্রয়োগ করার প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর চিন্তা, ভাষা ও উপস্থাপনায় ছিল ওয়াসাতিয়্যাহ মানহাজের বহিঃপ্রকাশ। উগ্রতা বা গোঁড়ামী তিনি সাপোর্ট করতেননা আবার ফাহেশা-অশ্লীলতা বন্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তিনি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করে দুর্নীতি তো দুরের কথা বৈধভাবে ঢাকায় একটি প্লট পাওয়ার সুযোগ থাকলেও তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, " ঢাকায় গোড়ানে আমার পৈত্রিক সম্পদে আমার অংশ আছে। ঢাকায় আমার কিছু নেই এই ধরনের মিথ্যা কাগজে স্বাক্ষর আমি দিতে পারবনা। আর আমি মাসিক কিস্তির টাকাই বা কিভাবে পরিশোধ করব"? আমি তাঁর সেগুন বাগিচার বাসাতেও গিয়েছি এবং গোড়াণের বাসাতেও গিয়েছি। ভোগ বিলাস পরিহার করে সাদা-সিধে জীবন যাপন করে তিনি আজ সকলের শ্রদ্ধা ও অনুপ্রেরণার উৎস।

আমরা অনেক সময় অপরের সমালোচনায় প্রচুর সময় নষ্ট করি এবং হর-হামেশা গীবত করি। আমি চাচাকে কখনও কারো গীবত করতে দেখেনি। তিনি সব সময় সকলের ইতিবাচক দিক নিয়ে কথা বলতেন। তিনি অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেননা। শুধু অর্থের অপচয় নয় তিনি কথা বলার সময় শব্দের অপচয় করেছেন আমি তা দেখেনি। তিনি

তিনি কুরআন- সুন্নাহর টেক্সট বর্তমান কনটেক্সট এর আলোকে বুঝতে এবং প্রয়োগ করার প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর চিন্তা, ভাষা ও উপস্থাপনায় ছিল ওয়াসাতিয়্যাহ মানহাজের বহিঃপ্রকাশ। উগ্রতা বা গোঁড়ামী তিনি সাপোর্ট করতেননা আবার ফাহেশা-অশ্লীলতা বন্ধে তিনি ছিলেন আপোষহীন। তিনি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করে দুর্নীতি তো দুরের কথা বৈধভাবে ঢাকায় একটি প্লট পাওয়ার সুযোগ থাকলেও তা গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, " ঢাকায় গোড়ানে আমার পৈত্রিক সম্পদে আমার অংশ আছে। ঢাকায় আমার কিছু নেই এই ধরনের মিথ্যা কাগজে স্বাক্ষর আমি দিতে পারবনা। আর আমি মাসিক কিস্তির টাকাই বা কিভাবে পরিশোধ করব"? আমি তাঁর সেগুন বাগিচার বাসাতেও গিয়েছি এবং গোড়াণের বাসাতেও গিয়েছি। ভোগ বিলাস পরিহার করে সাদা-সিধে জীবন যাপন করে তিনি আজ সকলের শ্রদ্ধা ও অনুপ্রেরণার উৎস।

অনেক বড় বড় বা জটিল বইয়ের সার সংক্ষেপ বোধগম্য ভাষায় সংক্ষেপে প্রচার করতেন। ফিকহসহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতের যারা সমালোচনা করতো তিনি তাদের প্রতিও ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। তাঁর চিন্তার কোনো ভুল সঠিক প্রমানসহ কেউ ধরিয়ে দিলে সাথে সাথে সংশোধন করে নিতেন। অহেতুক বিতর্ক করতেননা। ইখতিলাফ যেন ইফতেরাক তথা বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে না যায় তিনি তা বারবার বলতেন।

শাহ আব্দুল হান্নান চাচার অনেক গুণাবলী রয়েছে। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তাঁর বড় গুণ হচ্ছে, তিনি ছিলেন সত্যিকারের দায়ী ইলাল্লাহ। শুধু মৌখিক দাওয়াত নয় বরং বাস্তব জীবনে সত্যের সাক্ষ্য ছিলেন। যার কাছে সব সময় অপরকে দাওয়াত দেয়ার জন্য কোনো বই বা আর্টিকেল থাকতো। যিনি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের মাঝে দাওয়াত দিতেন। রিকশায় চলতে রিকশা চালককেও দাওয়াত দিতেন। আবার বড় বড় সরকারী আমলাদেরকেও দাওয়াত দিতেন। তিনি সর্বস্তরের মানুষের কাছে সার্বক্ষনিক দায়ী ছিলেন। তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। সদকায়ে জারিয়ার অনেক কাজ তিনি করেছেন। তিনি অনেক প্রতিষ্ঠান গড়েছেন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান হচ্ছে তিনি ছিলেন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর; তিনি অনেক লোক তৈরী করেছেন। পৃথিবীতে অনেক যোগ্য মানুষ আছেন। কিন্তু শাহ আব্দুল হান্নান চাচার মত কয়জন আছেন যারা সৎ যোগ্য লোক তৈরীকে জীবনের মিশন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অসংখ্য তরুণ-তরুনী আজ তাঁর জন্য অশ্রুসিক্ত নয়নে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছে। তিনি মানুষের সমস্যা সমাধানে ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। আমার মনে পড়ে ২০১৪ সালে তিনি আমাকে ইমেইল করেছেন এবং ফোন করেছেন তাঁর কাছে যাওয়া একজন ভাইয়ের একটি সমস্যা সমাধানে আমি কিছু করতে পারি কিনা?

মানুষ মরণশীল। কার কখন মরণ হবে জানিনা। মৃত্যুই পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বাস্তবতা। মানুষের মৃত্যুর পর চেনা-জানা মানুষেরা কিছু দিন শোকাহত থাকে। তারপর আস্তে আস্তে ভুলে যায়। কিন্তু পৃথিবীতে কিছু মানুষ জন্ম নেয় তারা মরেও হৃদয়ে অমর থাকে। তাদের চিন্তা ও কর্মের প্রভাব জীবিত থাকার সময়ের চেয়েও অনেক সময় মরণের পর বেশী অনুভূত হয়। শাহ আব্দুল হান্নান এমন একজন ব্যক্তি যিনি মৃত্যু বরণ করার পরও সকলের হৃদয় রাজ্যে অমর। যাঁর চিন্তা ও কর্ম অসংখ্য মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই সকলের হৃদয়ে আজ রক্তক্ষরণ হচ্ছে। সকলেই অশ্রুভেজা নয়নে মনীবের দরবারে ফরিয়াদ করছে, হে আরশে আজীমের মালিক শাহ আব্দুল হান্নানের সকল নেক আমল সমূহ কবুল কর। মানবিক দুর্বলতাসমূহ ক্ষমা করে দাও। তাঁকে রহমতের চাদরে জড়িয়ে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান কর। হে আল্লাহ শাহ আব্দুল হান্নান যেভাবে সদকায়ে জারিয়ার অনেক কাজ করেছেন। আমাদেরকে সদকায়ে জারিয়ার কিছু কাজ করার তাওফিক দান কর। হে আল্লাহ আমাকে এমনভাবে আমরণ আমলে সালেহ করার তাওফিক দান কর, যাতে জান্নাতে তোমার নেক বান্দাহরা যখন তোমার দীদার লাভ করবে আমিও তাদের সাথে জান্নাতে তোমাকে দেখতে পারি। আমীন।

লেখক: শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও গবেষক

হজ্জ ও কুরবানীঃ নেপথ্য কথা

মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম

হজ্জ ও কুরবানী। বিশ্ব মুসলিমের বিশ্বাস, ভক্তি ও আবেগের মহামিলন এ দুটি ইবাদাত। ইসলামী ইবাদাতের আনুষ্ঠানিকতায় এ দুটি কাজ ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। অনুষ্ঠানের সমসাময়িকতায় গোটা দুনিয়া যেনো একই স্রোতে মিলিত হয় জিলহজ্জ মাসে। আল্লাহ পরস্তির সুমহান নিদর্শন কুরবানী। আর হাজ্জ, শ্বাশত জীবন-ধর্ম ইসলামের অন্যতম ভিত। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম সম্পর্কে যাদের অল্প-বিস্তর ধারণা আছে তারা জানেন, হজ্জ ও কুরবানী ইসলামী শরীয়াতে সর্বশেষ নবীর মাধ্যমে নুতুন কোন সংযোজন নয়। এটি মানবেতিহাসের সুপ্রাচীন ইলাহী নেজামের ধারাবাহিকতা। কুরবানীর কুরআনী একটি পরিভাষা 'নুসুক' (نسك) বা 'মানসাক' (منسك)। সূরা হজ্জ এর ৩৪ নং আয়াত এ বিধানের চিরন্তন মেজাজ তুলে ধরেছে। সূরা আন'আমের ১৬২ নং আয়াতে এই 'নুসুক' হতে হবে কেবইলি আল্লাহ তায়ালার জন্য-তা বর্ণিত হয়েছে। পশু জবেহ করে আল্লাহর মর্জি যাচাইয়ের পদ্ধতি 'কুরবান' (قربان) নামে অভিহিত। আল কুরআনের সূরা মায়েদার ২৭তম আয়াত তার স্বাক্ষী। হাদীসে রাসূলের আলোকে কুরবানীর এ বিধান উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসরণে। আর হজ্জ এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা তো পিতা-পুত্রের যুগল হাতে কা'বা পুনঃনির্মাণের পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সেই ইবরাহীমের জবান দিয়েই দিয়েছেন। মানাসিকে হজ্জ তথা হজ্জ এর বিধি-বিধানের গোড়ার কথা বিচার করলে ফুটে ওঠে তিনটি নাম-ইবরাহীম, হাজেরা ও ইসমাঈল আলাইহিমুস সালাম। বাবা, মা ও পুত্রের সম্মিলনে একটি ক্ষুদ্র পরিবার । হজ্জ ও কুরবানীর বিধান জারিতে নেপথ্যের মূল চরিত্র এ তিনজনই। মানাসিকে হজ্জ এর প্রতিটি ধাপ এ ক্ষুদ্র নবী-পরিবারের সুমহান সংগ্রামী জিন্দেগীর স্বাক্ষী। এ তো নেতৃত্ব প্রদানের কুদরাতী নিয়মের ধারাক্রমে এক চির ভাস্বর কাহিনী। সুকঠিন পরীক্ষার প্রতিটি স্তরে সফলতম ব্যক্তিত্ব খলীলে ইলাহী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর ক্ষুদ্র পরিবারের বিশ্ব নেতৃত্বে আসীন হওয়ার অনবদ্য উপাখ্যান। দীর্ঘ সে উপাখ্যানের সারকথাই বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা বাকারার ১২৪ নং আয়াতে - وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

"স্মরণ করো যখন ইবরাহীমকে তার রব কয়েকটি ব্যাপারে পরীক্ষা করেন এবং সেসব পরীক্ষায় সে পুরোপুরি উতরে গেলো, তখন তিনি বললেনঃ আমি তোমাকে সকল মানুষের নেতার পদে অধিষ্ঠিত করবো। ইবরাহীম বললোঃ আর আমার সন্তানদের সাথেও কি এই অঙ্গিকার? তিনি জবাবে বললেন: আমার এ অঙ্গিকার জালেমদের ব্যাপারে নয়।"

তাই হজ্জ ও কুরবানীর হাকীকত বোঝার জন্য এ তিনটি নেপথ্য চরিত্রের প্রতি তাকাতে হবে। বর্ণিত এ পরিবারের দিকে তাকালে দেখতে পাবো, কিভাবে একটি ক্ষুদ্র পরিবার আল্লাহ পরস্তির সর্বোচ্চ নমুনা পেশ করে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে প্রধান চরিত্র খলীলুল্লাহ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম প্রধান চরিত্র। সুদীর্ঘ এ সংগ্রামী জীবনকে কয়েকটি কথার মোড়কে ধারণ একেবারেই অসম্ভব। তবুও আমরা দেখবো, রাজকীয় প্রধান ভাস্কর্য নির্মাতা আপন পিতা আজরের সাথে তিনি অহর্নিশি মূর্তি পূজার অসারতা তুলে ধরে যুক্তি উপস্থাপন করছেন। শিরকে নিমজ্জিত পিতাকে বাগে আনতে না পেরে অদম্য যুবক ইবরাহীম কাওমের লোকদের সাথে নিরন্তর বসচা করে চললেন। অসম সাহসিকতার সাথে তাদের এই ইবাদাতের বাতুলতা ও অর্থহীনতা তুলে ধরলেন। নিজের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য প্রধান উপাসনালয়ের সকল মূর্তিকে চূর্ণ করে প্রলয়ংকরী ঝড় তুললেন। পরিণতিতে ধৃত ইবরাহীম নমরুদের অগ্নিকুণ্ডলীতে বসে তৃপ্ত মনে হাসলেন। অবিচল ও নির্ভিক

দায়ী' আল্লাহদ্রোহী রাজার সাথে অসাধারণ বিতর্কে জয়ী হলেন। কাওমের সাথে চূড়ান্ত দুশমনির অধ্যায় তৈরি করে নিরুপায় ইবরাহীম আপন জন্মভূমি ছেড়ে হিজরতের পথ ধরলেন। নানা চড়াই উতরাই মাড়িয়ে জীবনের শেষ অধ্যায়ে আরো কঠিন পরীক্ষা দিলেন। আল্লাহর নির্দেশ পালনে দ্বিধাহীন নবী স্ত্রীসমেত শিশু পুত্র ইসমাঈলকে শূণ্য মরুতে রেখে আসলেন। সম্পন্ন করলেন সেই শিশুকে কুরবানীর আয়োজ-ন। রোমাঞ্চকর একেকটি অধ্যায় পার করে তিনি হলেন বিশ্ব নেতা। নিঃসঙ্কোচে প্রশান্ত চিত্তে আপন রবের সামনে 'ইসলাম' তথা আত্মসম-র্পণের এমন হৃদয়কাড়া নমুনা কোথায় পাওয়া যাবে? আল্লাহ তায়ালা সে স্বীকৃতিই দিলেন- إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
"যখন তার রব তাকে বললেন, 'মুসলিম' হও। তখনই বললো, আমি বিশ্ব জাহানের রবের নিকট নিজেকে সঁপে দিলাম।"
আপন খলীলের গুণগান আপন কালামে কতভাবেই না গাইলেন!
সূরা নাহলের ১২০-১২২ আয়াতে বললেন - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ -
"প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম একাই ছিল একটি পরিপূর্ণ উম্মাত, আল্লাহর হুকুমের অনুগত এবং একনিষ্ঠ। সে কখনো মুশরিক ছিলো না। সে ছিলো আল্লাহর নিয়ামাতের শোকরকারী। আল্লাহ তাঁকে বাছাই করলেন এবং সরল সঠিক পথ দেখালেন। দুনিয়ায় আমি তাকে কল্যাণ দান করলাম এবং আখিরাতে সে নিশ্চিত সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবে।"
সূরা হুদের ৭৫ আয়াতে বললেন - إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ
"আসলে ইবরাহীম ছিলো বড়ই সহনশীল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী এবং সে সকল অবস্থায় আমার অনুগামী।"
সূরা নাজমের ২৭ আয়াতে জানালেন وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى - "আর সে ইবরাহীমের কথা যে রবের আনুগত্য পুরোপুরিই করেছে"। আর কী স্বীকৃতি চাই!

জগতের বুকে এমন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নবী যাকে জীবন-সঙ্গিনী হিসাবে পেলেন তিনি কতই না মহিয়সী আর সাহসী নারী। শূণ্য মরুতে দুধের বাচ্চাকে রেখে যাওয়া স্বামীর প্রতি কোনো ক্ষোভ নেই। নেই কোনো রাগ। বরং বললেন, 'আমাদের এমন খাঁ খাঁ পাথুরে মরুতে রেখে যাওয়া যদি আল্লাহর নির্দেশে হয় তবে নিশ্চিন্ত থাকুন তিনি আমাদের হালাক করবেন না।' কী পরম নির্ভরতা আপন মা'বুদের প্রতি! প্রবল শক্ত সমর্থ পুরুষ যেখানে ভেঙে পড়েন সেখানে হাজেরা আলাইহাস সালাম একজন নারী, যিনি সকল দুর্বলতাকে জয় করলেন। আল্লাহর আনুগত্যে আপোষহীন সে নারী শয়তানের সকল ওয়াসওয়াসা মাড়িয়ে গেলেন। পিপাসার্ত শিশুর পেরেশানীতে এ পাহাড় থেকে সে পাহাড়ে তার ছুটোছুটি হয়ে থাকলো কিয়ামত পর্যন্ত সকল কা'বা যিয়ারাতকারীর আবশ্যক কাজ। কী অনুপম কুদরাতি স্বীকৃতি! সত্যের পথে অবিচলতার অসামান্য উদাহরণ হাজেরা। তাঁরই নাড়ি ছেঁড়া সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। যাঁর তুলতুলে কদমতলে জগতবাসীর জন্য উন্মুক্ত হলো আল্লাহর অবারিত রহমতের ঝর্ণাধারা 'জমজম'। যাঁর বংশধারা সংরক্ষিত হলো সাইয়িদুল আম্বিয়ার আগমনের জন্য। অনন্য মহিমায় সুবাশিত তিনি কুরআনের পাতায় পাতায়। আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

জগতের বুকে এমন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নবী যাকে জীবন-সঙ্গিনী হিসাবে পেলেন তিনি কতই না মহিয়সী আর সাহসী নারী। শূণ্য মরুতে দুধের বাচ্চাকে রেখে যাওয়া স্বামীর প্রতি কোনো ক্ষোভ নেই। নেই কোনো রাগ। বরং বললেন, 'আমাদের এমন খাঁ খাঁ পাথুরে মরুতে রেখে যাওয়া যদি আল্লাহর নির্দেশে হয় তবে নিশ্চিন্ত থাকুন তিনি আমাদের হালাক করবেন না।' কী পরম নির্ভরতা আপন মা'বুদের প্রতি! প্রবল শক্ত সমর্থ পুরুষ যেখানে ভেঙে পড়েন সেখানে হাজেরা আলাইহাস সালাম একজন নারী, যিনি সকল দুর্বলতাকে জয় করলেন। আল্লাহর আনুগত্যে আপোষহীন সে নারী শয়তানের সকল ওয়াসওয়াসা মাড়িয়ে গেলেন। পিপাসার্ত শিশুর পেরেশানীতে এ পাহাড় থেকে সে পাহাড়ে তার ছুটোছুটি হয়ে থাকলো কিয়ামত পর্যন্ত সকল কা'বা যিয়ারাতকারীর আবশ্যক কাজ।

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا "আর এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা স্মরণ করো। সে ছিলো ওয়াদা পালনে সত্যনিষ্ঠ এবং ছিলো রাসূল-নবী।"

অন্যত্র বলেন - وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ "আর এ নিয়ামতই ইসমাঈল, ইদরিস ও যুলকিফ্‌কে দিয়েছিলাম, এরা সবাই সবরকারী ছিলো। এবং এদেরকে আমি নিজের অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলাম, তারা ছিলো নেককার। আম্বিয়া ৮৫-৮৬ " আরো বলেন সূরা স-দের ৪৮ নং আয়াতে وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ "আর ইসমাঈল, আল ইয়াসা' ও যুল কিফল এর কথা স্মরণ করো। এরা সবাই সেরা লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো।" অনন্য বৈশিষ্ট্যের এ নবীর এতটুকুন ক্ষুদ্র বয়সে আনুগত্যের কী চরম পরা-কাষ্ঠা! আল্লাহর ভালোভাষায় কুরবান হতে চলা আপন পিতাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে পারেন يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ "প্রিয় বাবা! আপনার আদিষ্ট কর্ম আপনি সম্পাদন করুন। আমাকে ধৈর্যেশী-লদের মাঝেই পাবেন।" কী নিঃসঙ্কোচ আর দ্বিধাহীন মন! আল্লাহু আকবার!!

সাইয়্যিদুনা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের সর্বসেরা নজীর পেশ করলেন। পদে পদে তাঁর সঙ্গি ও সহযোগি হলেন স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈল। কুদরাতি পুরষ্কারে পুরষ্কৃত বিশ্বনেতা পৃথিবীর প্রথম ঘর কা'বা পুন:নির্মাণের দায়িত্ব পেলেন। বাপ বেটা মিলে কা'বা মুশাররাফার পূর্ণ অবকাঠামো দাঁড় করিয়ে ফেললেন। সুবহানাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীমী জবানে হজ্জের ঘোষণার ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহর ইরশাদ - وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ " এবং লোকদেরকে হজ্জের জন্য সাধারণ হুকুম দিয়ে দাও, তারা তোমার নিকট ছুটে আসবে দূর-দূরান্ত থেকে পায়ে হেঁটে ও উটের পিঠে চড়ে।"

ঘোষণা দিলেন নবুওয়াতি জবানে আর কায়মনোবাক্যে মা'বুদের নিকট দু'আ করলেন رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " হে আমাদের রব! আমাদের দু'জনকে তোমার মুসলিম(নির্দেশের অনুগত) বানিয়ে দাও। আমাদের বংশ থেকে এমন একটি জাতি সৃষ্টি করো যে হবে তোমার মুসলিম। আমাদেরকে মানাসিক তথা হজ্জের বিধি-বিধান শিখিয়ে দাও এবং আমাদের তাওবা কবুল কর। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।" বাকারা ১২৮।

দু'আ কবুল হলো। আল্লাহর আদেশে জিব্রীল আলাইহিস সালাম আসলেন। হাতে ধরে নবী ইবরাহীমকে হজ্জের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিলেন। তাঁর ক্ষুদ্র পরিবারের সংগ্রামী জীবনের একেকটি অধ্যায়কে হজ্জের অনুসঙ্গ বানিয়ে দেওয়া হলো। হাজার হাজার বছর ধরে মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণে হজ্জ পালিত হতে লাগলো। মুশরিকরা আচারে বিকৃতি আনলো; কিন্তু হজ্জ ছাড়লো না। ইবরাহীমকেই নেতা মানলো। ইহুদি নাসারারাও বিশ্বনেতাকে তাদের বাগে রাখতে চাইলো। অযোগ্যতা-র কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অনুসারীদের কাতার থেকে বহিষ্কার করলেন। ঘোষণা দিলেন - مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "ইবরাহীম না ছিলেন ইয়াহুদি, না ছিলেন নাসারা; বরং ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। মুশরিক তো আদৌ ছিলেন না।" আলে ইমরান ৬৭।

প্রতিষ্ঠিত হলো, মিল্লাতে ইবরাহীমের নিখাঁদ অনুসরণেই খাঁটি মুসলিম হওয়া যায়; নতুবা নয়। আলহামদুলিল্লাহ। শুরু থেকে এখনও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা চলমান আছে; থাকবে কিয়ামাত অবধি। মিল্লাতে ইবরাহীমের অনুসরণে। লক্ষ লক্ষ মুসলিম প্রতি বছর সে ইবাদাতের মিছিলে শামিল হচ্ছে। কিন্তু যাঁকে কেন্দ্র করে এই ইবাদাতের আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো তাঁর সাথে আমাদের চেতনা ও বৈশিষ্ট্যের কত ফারাক! 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হজ্জের আচার, বিদায় হজ্জের ভাষণ আর বর্তমানের হজ্জের আচার একই ধারায় প্রবাহিত তা কীভাবে দাবী করবো? আমার এ মূল্যায়ণ সামষ্টিক বিচারে; ব্যতিক্রম ব্যক্তি ও গোষ্ঠির বিচারে নয়। হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হলেই তো আমরা এ মূল্যায়ন করি 'হজ্জ মুসলমানদের মিলনমেলা' 'মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক' আরো কত কথা। আমার কাছে এটা কেবল ফজীলতের ওয়াজের মতো মনে হয়। এ ফজীলত আর বিশ্ব মুসলিমের বাস্তবতায় কত ব্যবধান! জমায়েত হওয়া মুসলিম ব্যক্তি আর গোষ্ঠিগুলোর মাঝে কতটুকুন মিলন হয়? বহুধা বিভক্ত মুসলিমের মাঝে ঐক্যের কী-ই বা সূত্র আবিষ্কৃত হয়? উম্মাহর সঙ্কট সমাধানে রাসূল (স) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের ভূমিকার সাথে আমদের ভূমিকার মিল কতটা? সৌদি আলে শায়খের খুতবার প্রভাব মুসলিম উম্মাহর জীবনে কতটুকুন? কী সবক গ্রহণ করেন সেখান থেকে মুসলিম নেতৃবৃন্দ?

এটা ব্যাপক বিশ্লেষণের পরিসর নয়। পাঠক শুধু আল্লাহর ঘর যিয়ারাতক-ারীর পঠিত 'তালবিয়া'র সাথে পাঠকারীদের জীবনের বাস্তবতা একটু মিলাবেন? শতকরা কতজনের সাথে মিল পাওয়া যাবে? আল্লাহর আহবানে কত সাড়াদানকারী সেখানে ভিড় করছেন যারা শয়তানের আহবানেও সাড়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। 'লা শারীকা লাকা' ঘোষণাকারী বাস্তব জীবনে কতভাবে যে আপন মা'বুদের সাথে শিরক করে চলছেন খবরই রাখেন না। মূর্তি-সংস্কৃতির মূলোৎপাটনকারীর অনুসারী বহু হজ্জ সমাপনকারী মানব-মূর্তির সামনে মাথা নোয়াতে দ্বিধা করেন না। নানান ভাস্কর্যের চেতনা থেকে সরে আসতে পারেন না। জীবিত কিংবা মৃত 'পীর-বাবার' সামনে মস্তক অবনত করার সময় 'লা শারীকা লাকা'র কথা একটুও মনে রাখেন না। 'আল হামদ্' 'আন নি'মাহ' 'আল মুলক' সব কিছুই আল্লাহর জন্য নিবদ্ধকারী অধিকাংশ ঘোষক বাস্তব জীবনে 'গাইরুল্লাহ'র প্রশংসা করেন বেশি কিংবা নিজের প্রশংসায় কোন ত্রুটি পছন্দ করেন না। আল্লাহর অনুগ্রহে প্রাপ্ত বিষয়াদিকে নিজের অধিকারের মতো মনে করেন। দুনিয়ার ক্ষুদ্র কিংবা বড় চেয়ারে বসে 'মালিকুল মুলক' এর কথা বেমালুম ভুলে থেকে নিজেকেই রাজা মনে করেন। অন্যদের প্রজা জ্ঞান করেন। একদিন আসল রাজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কর্মকাণ্ডের কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব দিতে সেটা কতজনে মনে রাখতে পারেন? হায়! আমাদের তালবিয়া! কোথায় মিল্লাতের পিতা ইবরাহীমের তালবিয়া? আর কোথায় পূর্ণাঙ্গ 'উসওয়া' রাসূলুল্লাহর তালবিয়া? হায়! মুসলিম মিল্লাতের দাবীদার অভিভাবকদের তালবিয়া! আর কোথায় খোলাফায়ে রাশেদীনের তালবিয়া? বিস্তর ফারাক। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আপোসহীন তাওহীদী চেতনা ব্যতিরেকে কীভাবে মুসলিম উম্মাহ ঘুরে দাঁড়াবে? কুণ্ঠাহীন ইসমাঈলী মন ও মনন ব্যতিরেকে কীভাবে ইবরাহীমের উত্তরসূরীগণ তাদের উপর আপতিত বিপদের মোকাবিলা করবে? সাফা

মারওয়াতে সা'য়ীকারী উম্মাহ যদি হাজেরা আলাইহাস সালামের জীবন থেকে সবক গ্রহণ না করেন তবে তারা কীভাবে আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকবে?

ইবরাহীমী চেতনা, ইসমাঈলী মনন আর হাজেরার মতো ত্যাগের মানস লালনকারীই কুরবানীর বিধান নাযিলে যে হিকমাত রয়েছে তা অনুভব করবে। আল্লাহ তায়ালা কুরবানীর হিকমাত বর্ণনায় সূরা হজ্জে ইরশাদ করেন - ক. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ "যাতে (সে উম্মাতের) লোকেরা সে পশুদের উপর আল্লাহর নাম নেয় যেগুলো তিনি(আল্লাহ) তাদেরকে দিয়েছেন।"

খ. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "আর এ পশুগুলোকে আমি এভাবেই তোমাদের বশীভূত করেছি, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো।"

গ. وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ "কিন্তু তার কাছে পৌঁছে যায় তোমাদের তাকওয়া।"

ঘ. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ "তিনি তাদেরকে তোমাদের জন্য এমনভাবে অনুগত করে দিয়েছেন যাতে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো। লক্ষণীয় বিষয়, কুরবানীর পশুকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর شَعَائِر এর একটি বলেছেন। شَعَائِر এর একবচন شعار বা شعيرة । 'শা'য়ীরা' বলা হয় এমন নিদর্শনকে যা অর্ঘ্যের মতো বিশেষ কোনো পূজনীয় সত্ত্বার সামনে আনুগত্যের স্বীকৃতি হিসেবে পেশ করা হয়। তাই সহজেই বোধগম্য, কুরবানীর ছুরির তলায় মূলত পশুটি নয়, যেনো পশু জবাইকারী আল্লাহর সামনে নিজের সত্ত্বাকে বিলিয়ে দিলেন। যেমনটি করেছিলেন পিতা-পুত্র ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম। আপন মনের খেয়াল-খুশিকে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার সামনে নিঃসঙ্কোচে এমন কুরবানি করতে পারাটাই 'ইসলাম'। কুরবানীর মাধ্যমে বান্দাহর এমন আত্মসমর্পণ চেয়েই আল্লাহ তা'আলা বলেন - فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ "অতএব তোমাদের সে একজনই। তোমরা তারই ফরমানের অনুগত হও। আর হে নবী! সুসংবাদ দাও বিনয়ের নীতি অবলম্বনকারীদের।"

বিনয়ের সে মানসিকতা যাদের নেই তাদের অন্তর কীভাবে আল্লাহর ভয়ে ভীত হবে? কীভাবে তারা আপতিত বিপদের দিনে সবর করবে? সম্ভব কি তাদের পাঁচ ওয়াক্ত সলাত কায়েম করা? কীভাবেই বা তারা দ্বীনের জন্য খরচের হাত উন্মুক্ত রাখবে? যে গুণাবলীগুলো সূরা হজ্জের ৩৫ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। আপনাকে বিলিয়ে দেওয়ার সে মেজাজ তৈরি না হলে কীভাবে জীবনের প্রতিটি পরতে আল্লাহর বড়ত্বের ঘোষণা দিবে? সে তো নামাজের বাইরে তাকবীরের আওয়াজ শোনেই ভড়কে উঠবে। আজান আর নামাজের বাইরের 'তাকবীর ধ্বনি' তার কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হবে। জীবনের অধিকাংশ দিক যে বহু জায়গায় বন্ধক দিয়ে রেখেছে সে আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মর্ম বুঝবে কী করে?

সে কীভাবে শিরকের ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ হবে? তার হজ্জ-কুরবানীর অর্থ খরচে বাহ্যিক ইসলাম আছে কিন্তু তার কলবে এখনো ঈমান প্রবেশ করে নি। সে কথাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন - قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ "বলে দাও! তোমরা ঈমানই আনো নি। বরং বলো, 'আমরা কিছু বাহ্যিক আচার পালন করছি।' আসলে এখনো তোমাদের মনে ঈমান প্রবেশ করে নি।"(হুজরাত-১৪)

পাঠক শুধু আল্লাহর ঘর যিয়ারাতকারীর পঠিত 'তালবিয়া'র সাথে পাঠকারীদের জীবনের বাস্তবতা একটু মিলাবেন? শতকরা কতজনের সাথে মিল পাওয়া যাবে? আল্লাহর আহবানে কত সাড়াদানকারী সেখানে ভিড় করছেন যারা শয়তানের আহবানেও সাড়া দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

'লা শারীকা লাকা' ঘোষণাকারী বাস্তব জীবনে কতভাবে যে আপন মা'বুদের সাথে শিরক করে চলছেন খবরই রাখেন না। মূর্তি-সংস্কৃতির মূলোৎপাটনকারীর অনুসারী বহু হজ্জ সমাপনকারী মানব-মূর্তির সামনে মাথা নোয়াতে দ্বিধা করেন না। নানান ভাস্কর্যের চেতনা থেকে সরে আসতে পারেন না। জীবিত কিংবা মৃত 'পীর-বাবার' সামনে মস্তক অবনত করার সময় 'লা শারীকা লাকা'র কথা একটুও মনে রাখেন না।

তবে এমন হজ্জ আর কুরবানকারী কীভাবে কাঙ্খিত মুহসিনীনদের কাতারে নাম লিখাবে? তাই হজ্জ ও কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষাকে সামনে রেখে আমাদের করণীয় ঠিক করতে হবে। আমাদের উচিত

ক.তাওহীদের যথাযথ ইলম অর্জন করা। বিপরীতে শিরকী আচরণের ব্যাপারে সচেতন হওয়া।

খ. যাবতীয় শিরকের বিরুদ্ধে আপোসহীন থাকা।

গ. জীবন বিধান ইসলামের সর্বব্যাপী ধারণা লাভ করা।

ঘ. ইসলামের বিপরীত মতাদর্শের সাথে চির বৈরিতা সৃষ্টি করা।

ঙ. ইবরাহীমী মিল্লাতের পূর্ণতা বিধানে আপোসহীন নেতা মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে গ্রহণ করা।

চ. আপন আমিত্ব, ব্যক্তির অন্ধ-অনুকরণ, বস্তু-পূজা, গোষ্ঠি-প্রীতি, দলান্ধ মেজাজ, অযাচিত দেশ-প্রীতি এ সব কিছুকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ইচ্ছার কাছে সঁপে দেওয়া।

ছ. একটি ক্ষুদ্র পরিবার কীভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পারে তা গভীরভাবে চিন্তা করা এবং বর্তমানের পিতামাতা ও সন্তানদের সে আলোকে গড়ে তুলে আমাদের পরিবারগুলোকে দুর্গে পরিণত করা।

ঝ. খুতবা ও বিভিন্ন আলোচনায় মৌলিক ইবাদাতসমূহের অন্তর্নিহিত দিক তুলে ধরার ব্যবস্থা করা।

জ. হজ্জ ও কুরবানীকে ঘিরে সৃষ্টি হওয়া সাময়িক ঐক্যচেতনাকে কাজে লাগানোর জন্য উম্মাতের মুক্তি চেতনায় বিভোর নেতৃত্বকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইবরাহীমী চেতনায় উজ্জিবীত হয়ে উম্মাহর ক্রান্তিলগ্নে কাঙ্খিত ভূমিকা পালন করার তাওফীক দিন। আমীন।

লেখক: আরবী প্রভাষক, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, টঙ্গী
খতীব, আনছারিয়া কমপ্লেক্স জামে মসজিদ, লাকসাম, কুমিল্লা

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম
কারিগরি বিদ্যা গ্রহণ করুন
বেকারত্ব দূর করুন
ভর্তি চলছে
বাংলাদেশ গার্মেন্টস ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট
মাত্র ৩০ দিনে সুইং অপারেটরের কাজ শিখুন
● প্লেইন মেশিন ●২ নিডেল ●অভারলক ●ফিডলক ●কানসাই
চাকুরীজিবী ভাই-বোনদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা।
প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরীর ব্যবস্থা আছে
☆ বিঃ দ্রঃ থাকা খাওয়ার সু-ব্যবস্থা রয়েছে।
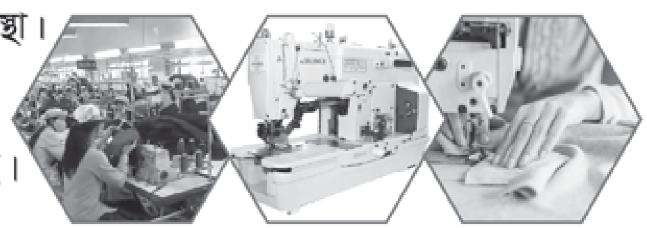
যোগাযোগ ঃ ০১৩০৯-৪৮০৮১৭, ০১৯৫৪-১৫৯৭৪৬
আওলাদ মার্কেট, (হাজী মার্কেটের পূর্ব পর্শ্বে), চান্দনা মধ্যপাড়া, ১৭নং ওয়ার্ড, গাজীপুর মহানগর।

আশুরার চেতনা ও আমরা

হাফেজ মাওলানা নূর হোসাইন

মহররম মাসের ১০তারিখকে আমরা সাধারণভাবে আশুরা বলে থাকি। আরবি ১২টি মাস মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করে দেয়া। ১২টি মাসের মধ্যে মহররম হলো প্রথম মাস। আবার ১২টি মাসের মধ্যে ৪টি মাসকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র বা সম্মানিত মাস বলে ঘোষনা করেছেন। কেননা এই ৪টি মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা থেকে আরবের মানুষ বিরত থাকত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে মাসসমূহের সংখ্যা ১২টি নির্ধারিত। সেদিন থেকে যেদিন তিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্য থেকে ৪টি সম্মানিত। এটাই প্রতিষ্ঠিত দ্বীন। সুতরাং তোমরা এ মাসসমূহে নিজেদের উপর কোনো যুলম করোনা।(সূরা তাওবা: ৩৬)।

মহররম মাসের ১০ তারিখকে বলা হয় আশুরা। আশুরা শব্দটি আরবী যার অর্থ হলো দশ। মুসলিম বিশ্বের কাছে আশুরা অনন্য এক দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। অতীত সকল উম্মাহর উপর আশুরার রোযা ফরজ ছিল। মাহে রমজানের রোযা ফরজ হওয়ার পর এটাকে নফল হিসেবে পালন করা হয়। তবে ইয়াহুদীরা এখনো আশুরার রোযাকে ফরজ হিসেবে পালন করছে। নানান ঘটনার সাক্ষি এই আশুরার দিনটি। যার শেষ হয়েছে নবী (সা.) এর প্রিয় দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (রা.) ও তার পরিবার বর্গের কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত।

আশুরা মুসলিম জাতির বিজয় ও শুকরিয়ার দিন:

নবী করিম (সা.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তথা নবুয়াতের ১৩তম বছরে মদীনায় হিজরত করেন। দিনটি ছিলো ১২রবিউল আউয়াল। মদিনায় আসার পর তিনি দেখতে পেলেন মদিনার জনগন মহররমের ১০তারিখ বা আশুরার দিনে সিয়াম বা রোযা পালন করছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আমরা তার দলিল খুঁজে পাই নবী (সা.) মদীনায় এসে দেখেন যে,ইয়াহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখছে। তিনি তাদেরকে বললেন, কি কারণে তুমি এই দিনে রোযা পালন করছো? তারা বললো এটি একটি মহান দিন। এই দিনে আল্লাহ তায়ালা মুসা (আ:) ও তার জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। আর ফেরাউন ও তার জাতিকে সাগরে ডুবিয়ে শেষ করে দিয়েছেন। এজন্য মূসা (আ:) এই দিনে কৃতজ্ঞতা স্বরুপ রোযা পালন করেছেন। তাই আমরাও এই দিনে রোযা পালন করে থাকি। তখন রাসূল (সা.) বললেন মূসা (আ:) এর ব্যাপারে আমাদের অধিকার বেশি। এরপর থেকে নবী (সা.) এই দিনে রোযা পালন করেন ও আমাদেরকে রোযা পালন করার নির্দেশ দেন।

মূসা (আ:) এর সেই ঘটনাটি আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে এভাবেই বর্ণনা করেছেন

وَجَاوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَّعَدْوًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِيٓ آمَنَتْ بِهِ بَنُوٓا إِسْرَآءِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ آٰلْـَٰٔنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ

অতঃপর আমি বনী ইসরাইলকে সমুদ্র পার করিয়ে নিলাম। আর ফেরাউন ও তার বাহিনী ঔদ্বত্য প্রকাশ ও সীমালঙ্ঘন হয়ে তাদের পিছু নিলো। অবশেষে যখন সে ডুবে যেতে লাগলো, তখন বললো, আমি ঈমান এনেছি সেই সত্তার ওপর যেই সত্তা ছাড়া কোনো ইলাহ নেই যার

প্রতি বনী ঈসরাইল ঈমান এনেছে। আর আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এখন! অথচ ইতঃপূর্বে তুমি নাফরমানি করেছ। আর তুমি ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করব, যাতে তুমি পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক। নিশ্চয় অনেক মানুষ আমার নিদর্শন সমূহের ব্যাপারে গাফেল। (সূরা ইউনুস : ৯০-৯২)

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ

আর তোমাদের জন্য যখন আমি সমুদ্রকে বিভক্ত করেছিলাম। তখন তোমাদের নাজাত দিয়েছিলাম, আর ফেরাউনের দলকে ডুবিয়ে মেরেছিলাম। আর তোমরা তা দেখছিলে। (সূরা বাকারা : ৫০) তাই আমরা বলতে পারি মুসলিমদের নাজাতের দিন হিসেবে নবী (সা.) নিজে রোযা রেখেছেন ও রোযা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কারবালার সাক্ষী আশুরা

রাসূল (সা.) এর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.) ও তার পরিবারবর্গের কারবালার প্রান্তরে শাহাদাতের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা এই ছোট্ট পরিসরে অসম্ভব। তারপরেও মূল ঘটনাটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ইসলামের আগমনের আগে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব চলত বংশ পরম্পরায়। ইসলামের আগমনে নবী (সা.) সর্বপ্রথম আধুনিক জন-গণতান্ত্রিক পরামর্শভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের খাদেম হিসেবে কাজ করতেন। আর জনগনের পরামর্শের ভিত্তিতে খলিফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হলেও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বা সর্বময় ক্ষমতা ছিল মহান আল্লাহ তায়ালার। সামান্য ব্যতিক্রমসহ এই প্রক্রিয়ায় ইসলামের ৪জন খলিফাই নির্বাচিত হয়েছেন। হযরত আলী (রা.) এর মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র হযরত হাসান (রা.) ৬মাস খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেন। ৬মাস পর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর পক্ষে খিলাফাত ত্যাগ করেন। এরপর থেকে প্রায় ২০ বছর পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করেছেন। তার বার্ধক্য অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে পরামর্শ সভাকে ডাকেন পরবর্তী খলিফা মনোনয়োনের বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য। তারা সবাই ইয়াজিদের পক্ষে পরামর্শ দেন। ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ বলেন যে, ইয়াজিদ পূর্বেই পরামর্শ সভার সদস্যদের উৎকোচের মাধ্যমে নিজের পক্ষে কথা বলার জন্য রাজি করিয়ে নেয়। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) মনোনয়োনের পরে বলেন যে, জনগন তার হাতে বায়াত নিলেই সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারবে। অতঃপর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করলে মক্কা, মদিনা ও ইরাক বিশেষ করে কুফার জনগন ইয়াজিদের হাতে বায়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। কুফার জনগন হযরত হোসাইন (রা.) কে বারবার চিঠি পাঠাতে থাকে যে, সুন্নত জীবিত রাখতে আমরা আপনার হাতে বায়াত নিতে চাই! অনেকগুলো চিঠি পেয়ে হযরত হোসাইন (রা.) মক্কা ও মদীনার সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলে সবাই তাকে কুফায় যেতে নিষেধ করেন। তারপরও সুন্নত সমুন্নত রাখতে তিনি পরিবারের ১৯জন সদস্যসহ মোট ৫০জনের কাফেলা নিয়ে কুফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এই খবর পেয়ে ইয়াজিদ কুফার গর্ভনর নুমান ইবনে বশির (রা.) কে পদচ্যুত করে তদস্থলে উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে বসান। উবায়দুল্লাহ কুফায় পৌঁছে হোসাইন (রা.) আহবানকারি সকলের শরীর থেকে মাথা আলাদা করে নেয় জনসন্মুখে। আর যারা জীবিত ছিল তারা ভয়ে একটি কথাও উল্লেখ করেনি। ওবায়দুল্লাহ ৪ হাজার সৈন্যের বাহিনী পাঠান হযরত হোসাইন (রা.)এর পথ আটকানোর জন্য। তারা কারবালার প্রান্তরে পথ আটকালে হযরত হোসাইন (রা.) বলেন, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি। তোমরা কুফার জনগন আমাদের আসার জন্য আহবান করেছ, আর এখন তোমরা তোমাদের কথা থেকে সরে গেছ! তিনি তিনটি প্রস্তাব দিলেন। উবায়দুল্লাহ প্রথমে রাজি হলেও সীমার নামে তার এক সহচর বলল, হোসাইনকে বাগে পেয়েও যদি ছেড়ে দেন তাহলে আপনার পদোন্নতি হবে কেমন করে। পাশের নদী থেকে পানি আনতে না দেয়ায় মহিলা ও শিশুরা কষ্টে পতিত হয়। ফলে হোসাইন (রা.) সহ পুরুষরা যুদ্ধ শুরু করে। সাথীরা সবাই শহীদ হয়ে গেলেও হোসাইন (রা.) যুদ্ধ করতে থাকেন। একপর্যায়ে সীনান নাখয়ী নামক এক পাপিষ্ঠের আঘাতে হযরত হোসাইন (রা.) মাটিতে পড়ে যান। অতঃপর পাষন্ড সীমার হোসাইন (রা.) এর শরীর থেকে পবিত্র মাথাকে আলাদা করে নেয় ও ঘোড়া ছুটিয়ে পবিত্র দেহকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সে রাতে রাসূল (সা.) এর এক স্ত্রী রাসূল (সা.) কে ধুলোবালিতে মলিন চেহারা অবস্থায় দেখতে পান। এমন অবস্থা কেন? জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে রাসূল (সা.) বলেন, আমি কারবালা থেকে আসলাম, এইমাত্র কারবালাতে আমার হোসাইনকে শহীদ করা হলো! ইয়াজিদ উবায়দুল্লাহকে বলল, আমি তোমাকে হত্যা করতে বলিনি, এমন বললেও বাস্তবিক পক্ষে উবায়দুল্লাহকে কোন ধরণের শাস্তি না দেয়ায় তার সম্মতি বুঝা যায়।

আশুরা নিয়ে অনির্ভরযোগ্য কথা

আল কুরআন ও হাদিসের দলিলের আলোকে কোন জায়গায় কিছু ঘটনা আশুরার সাথে সম্পর্কিত না হলেও আমরা তা আশুরার ঘটনা বলে উল্লেখ করে থাকি। এমনকি মসজিদে মসজিদে ওয়াজেও এমন আলোচনা করতে শুনা যায়। আর সেগুলো হলো,

- আল্লাহ তায়ালা আশুরার দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন।
- হযরত আদম (আ.) এর পৃথিবীতে আগমন ঘটেছে।
- হযরত আদম (আ.) এর তওবা কবুল হয়েছে।
- হযরত দাউদ (আ.) এর দোয়া কবুল হয়েছে।
- হযরত আইয়ুব (আ.) রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন।
- হযরত ইবরাহিম (আ.) নমরুদের আগুন থেকে মুক্ত হয়েছেন।
- হযরত সোলাইমান (আ.) হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পেয়েছেন।
- হযরত নূহ (আ.) এর সময়ের প্লাবন বন্ধ হয়েছে।
- হযরত ঈসা (আ.) কে আকাশে তুলে নেয়া হয়েছে। এবং
- এই দিনে কিয়ামত সংগঠিত হবে।

দলিল নেই এমন কথাগুলো বলা থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত।

আশুরাতে যা বর্জন করতে হবে :

আশুরাকে কেন্দ্র করে এমন কোন কাজ করা যাবে না, যা ইসলাম অনুমোদন দেয় না। যেমন,

- শিয়াদের মতো শোক পালন, শরীর ছিঁড়ে রক্তাক্ত করা ইত্যাদি عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعًا: «ليس مِنَّا من ضرب الْخُدُودَ، وشَقَّ الْجُيُوبَ، ودعا بِدَعْوَى الجاهلية রাসূল (সা.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তি আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়, যে গালে চপেটাঘাত করে ও বক্ষদেশে আঘাত করে তা বিদীর্ণ করে এবং জাহিলিয়াতে ডাকের মতো আহবান করে। (বুখারি : ১২৯৭)
- এইদিনে ঘর-বাড়ী ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করাকে অনেক পূণ্য মনে করা।
- সুন্দর ও রুচিসম্মত খাবার তৈরি করাকে বরকতময় মনে করা।

- মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা।
- আতশবাজি ও তাজিয়া মিছিল করা।
- মহিলারা সৌন্দর্য চর্চা করা।
- এ মাসে জন্মগ্রহনকারী শিশুকে দুর্ভাগা মনে করা।
- দূর্বল ও মিথ্যা কথা বানিয়ে আশুরার আলোচনা করা।

আশুরাতে করণীয়

আশুরার দিনে নবী (সা.) ও সাহাবারা শুকরিয়া হিসেবে রোযা পালন করেছেন। عن ابن عباس(رضي الله) بصوم عاشوراء يوم العاشر ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের কে নবী (সা.) আশুরার রোযা রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিযি : ৭৫৫)

শুধু আশুরার দিনে রোযা রাখা যাবে না। তার আগের অথবা পরের দিন মিলিয়ে রাখতে হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন,

صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود: صوموا قبله يوماً، وبعده يوماً

তোমরা আশুরার দিন রোযা পালন কর। আর ইয়াহুদীদের সাথে পার্থক্য করার জন্য আগের দিন অথবা পরের দিন মিলিয়ে দুইদিন রোযা রাখ। (তিরমিযি : ২১৫৪)

আরো তথ্যের জন্য আমরা দেখতে পারি, বুখারি-১৮৬৭,মুসলিম ২৭২৫,২৮০৪, ২৮১২, তিরমিযি-৭৫৫ এবং মুসনাদে আহমদ-৩২১৩)

সবশেষে বলব, কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনার সাথে অনেকেই হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কে জড়িয়ে ফেলেন। যা নিতান্তই বোকামী। সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে রোমের বাদশা হযরত আলী (রা.) এর বিপক্ষে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) কে সহযোগিতা করতে চাইলে, মুয়াবিয়া (রা.) রোমের বাদশাহকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন ياكلب الرم হে রোমের কুত্তা! আমরা দুই ভাই ঝগড়া করব, তুই নাক গলাবি কেন? এতে বোঝা যায়, তারা সঠিক পথে ছিলেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সব দোষ ইয়াজিদেরই। প্রতি বছর আশুরা আসে আর যায়, কিন্তু হোসাইন (রা.) এর শাহাদাতের কারণ জেনে দ্বীন বা খিলাফাত প্রতিষ্ঠার চেতনা আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় না। আসুন আশুরার বর্জণীয় দিকগুলো পরিহার করে অর্জণীয় দিকগুলো গ্রহন করি এবং আশুরার চেতনাকে লালন করে দ্বীন কায়েমের পথে আরো বেশি অগ্রসর হই। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কবুল করুন। আমিন।

লেখক: আহবায়ক, বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্রকল্যাণ পরিষদ ও নির্বাহী সম্পাদক, দ্বিমাসিক মাদরাসা।

লেখা আহবান

ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার সকল পাঠক, শুভাকাঙ্খী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট থেকে ত্রৈ-মাসিক শ্রমিক বার্তার জন্য শ্রম, শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন বিষয়ক প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ইতিহাস, সমসাময়িক বিষয়, স্মৃতিচারণমূলক লেখা এবং বিভিন্ন ট্রেড/পেশাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ন লেখা আহবান করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৪০৩৯০৯১৮৯, ০১৮২২০৯৩০৫২
E-mail: sramikbarta2017@gmail.com

একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও আমাদের সমাজ ব্যবস্থা

অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসাইন

দুনিয়ায় বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের বসবাস। মানুষের এই শ্রেণি পেশার ভিন্নতার কারণেই পৃথিবী এত সুন্দর ও বৈচিত্র্যময়। মানুষ তার নিজ নিজ পেশায় দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মানুষ তার যোগ্যতানুযায়ী কাজ পেয়ে থাকে। কিন্তু সবার কাজ সমান নয়। সব মানুষ যদি সমান হতো তাহলে এই পৃথিবী একদিনেও চলতো কিনা সন্দেহ আছে।

কেউ কাজ করে এসি রুমে কেউ রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা আর দুর্গন্ধময় জায়গায়। যা সবার কাছেই ঘৃণার, সবারই চরম অপ্রিয়। কিন্তু কিছু মানুষের জীবন কাটে এই ময়লা-আবর্জনার মাঝেই। আমরা তাদের নাম দিয়েছি ঝাড়ুদার ও ময়লা পরিষ্কারকারী। আসলেই তারা পরিচ্ছন্নতা কর্মী। দুর্গন্ধ আর ঘৃণাকে হজম করে রাজধানীসহ সারা দেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে রাতদিন কাজ করছেন তারা। ময়লা ধরতে গেলে ঘৃণা করলে তো হবে না। তাদের সব সয়ে গেছে। এই রকম মনে করেন এই সেক্টরের শ্রমজীবী মানুষেরা।

রাজধানীর দুই সিটির অধীনে কাজ করছেন প্রায় সাড়ে ৭ হাজার নিবন্ধিত পরিচ্ছন্নতা-কর্মী। আর এলাকাভিত্তিক ব্যবস্থাপনায় কাজ করছেন আরো প্রায় ৪ হাজার কর্মী। এর বাইরেও প্লাস্টিকসহ বিভিন্ন দ্রব্য কুড়ানোর বিনিময়ে কাজ করেন বেশকিছু হতদরিদ্র মানুষ। বাসাবাড়ি থেকে ডাস্টবিন ও ডাস্টবিন থেকে মূল ভাগাড়ে আবর্জনা চলে যাচ্ছে এই মানুষগুলোর হাত ধরেই। নিবন্ধিতদের বেতন চলনসই হলেও স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় তা নগণ্য। আর অবশিষ্টদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এই কঠিন কাজে জড়িয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুকেই যেন আলিঙ্গন করছেন তারা।

এক তথ্যমতে, গত এক যুগে শুধুমাত্র রাজধানীতে মারা গেছেন ৮১৪ জন নিবন্ধিত পরিচ্ছন্নতা-কর্মী। ২০০৬ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা প্রতি বছর ৫৩ থেকে ৭২ পর্যন্ত উঠানামা করলেও ২০১৭ সালে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৮জনে। এদের মধ্যে অ্যাজমায় ২৭ শতাংশ, ক্যান্সারে ২২ শতাংশ, হৃদরোগে ১৮ শতাংশ, স্ট্রোক করে ৭ শতাংশ এবং বার্ধক্য ও দুর্ঘটনাজনিত কারণে মারা গেছেন ২৬ শতাংশ কর্মী। আর নিবন্ধনের বাইরে থাকা কর্মীদের ব্যাপারে এ সংক্রান্ত কোনো তথ্যই কারো কাছে নেই। সার্বিক বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্টরা। বাংলাদেশ মেডিকেলের তথ্যমতে, এই সেক্টরের শ্রমিকদের আয়ুষ্কাল অনেক কম। অনেক আগেই হয়ত তারা মারা যাচ্ছেন। তাদের স্বাস্থ্যর প্রতি গুরুত্ব দেয়া দরকার। পরিচ্ছন্নকর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে সিটি করপোরেশন গুরুত্বসহকারে কাজ করা উচিত বলে মনে করেন দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তিরা। ডিএসসিসি এক সূত্রমতে,এসব পরিচ্ছন্নকর্মীরা হঠাৎ করে স্ট্রোক করে মারা যায়। তাদের সেবার জন্য যথেষ্ট কেয়ার নেয়া হচ্ছে না । উন্নয়ন কর্মীরা বলছেন, পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলে পরিবর্তন আসতে পারে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের।

একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানে কাজ করেনঃ

যে কোনো ধরনের সরকারি,বেসরকারি,সামরিক অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশনে একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী কাজ করেন।

কী ধরনের কাজ করেনঃ

একজন অফিস ক্লিনারের কাজ অফিসের রুম, আসবাবপত্র, টয়লেট সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। অফিসের, চেয়ার-টেবিল, ডেস্ক-শেলফ, ফ্যান থেকে শুরু করে অফিসের সামনের জায়গাও তার কাজের আওত-াধীন। পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী অত্র এলাকার রাস্তা-ঘাট, উদ্যান, শিশু পার্ক এবং পৌর সংস্থার আওতাধীন স্থাপনাসমূহ পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত থাকেন।

একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর যোগ্যতা কীঃ

স্থানভেদে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কাজে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়। কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠানে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হলেই যথেষ্ট। আবার কিছু প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাশ হতে হয়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ন্যূনতম ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পাশ হতে হয়। তবে চাকুরি প্রার্থীর পূর্বে এ পদে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যায়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরির ক্ষেত্রে হরিজন সম্প্রদায় কিংবা বংশানুক্রমে সুইপারের কাজ করে আসা প্রার্থীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে উক্ত সম্প্রদায়ের জন্য ৮০ ভাগ পদ সংরক্ষণ করা হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা কর্মী পদে আবেদনের জন্য প্রার্থীর বয়স ১৮-৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মাসিক আয়ঃ

সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মীর বেতন গ্রেড-২০ অনুসারে ৯ হাজার টাকা। এ গ্রেডে সর্বোচ্চ বেতন ২০ হাজার টাকা। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় দৈনিক ভিত্তিতে বেতন দেওয়া হয়। তবে সংস্থাভেদে সর্বসাকুল্যে এ বেতন মাসিক ৫-৯ হাজার টাকা। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর বেতন ৮-১২ হাজার টাকা। কাজের পরিধি ও ব্যাপ্তি অনুযায়ী বেতন খুবই সামান্য। এতো অল্প বেতনের টাকা দিয়ে শহরে জীবনযাপন করা সত্যিই কষ্টসাধ্য। পশ্চিমা দেশ গুলোতে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি এবং কাজের চাপ খুবই কম। এর কারণ তাদের দেশের লোকজন খুবই সচেতন। একটি কলার খোসা এখানে-সেখানে না ফেলে নিদিষ্ট ডাষ্টবিন খুজে সেখানে ফেলে দেয়। এই দায়িত্ববোধ ও ট্রেণিং স্কুল জীবনে দেয়া হয়ে থাকে।

উন্নত দেশ গুলোতে আবর্জনা ব্যবস্থাপনাঃ

স্কুলে শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে অংশ নেন জাপানের শিক্ষার্থীরা। সারা দিনের সব ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের স্কুল ব্যাগ নিয়ে যখন অপেক্ষা করে যে কখন বাড়ি যাবে। তখন তারা ধৈর্য্য সহকারে শুনছে যে তাদের শিক্ষক পরবর্তী দিনের সময়সূচী সম্পর্কে কিছু বলছেন। আর শিক্ষকের শেষ শব্দগুলো ছিলো: "ওকে, সবাই শোনো আজকের ক্লিনিং রোস্টার। প্রথম ও দ্বিতীয় সারি শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার করবে। তৃতীয় ও চতুর্থ করিডোর, সিঁড়ি আর পঞ্চম লাইনে যারা আছো তারা টয়লেটগুলো পরিষ্কার করবে। পঞ্চম সারি থেকে কিছুটা কান্নার মতো শব্দ আসলেও শিশুরা উঠে দাঁড়ালো এবং ক্লাসরুমের পেছনে রাখা সব উপকরণ নিয়ে টয়লেটের দিকে দৌড়ে গেলো।

হাফেজ থেকে পরিচ্ছন্নতা কর্মীঃ

উগান্ডার নাগরিক হাফেজ শাহারভি সিরাজী। পড়াশোনা করেছেন নিজের দেশের এক মাদরাসাতে। কাতারের একটি মসজিদে পরিচ্ছন্ন কর্মীর কাজ করছেন ইদানিং। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কল্যাণে বিশ্ব মুসলিমের কাছে পরিচিত হয়েছেন তিনি। নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে তাকে মসজিদ পরিষ্কার করতে করতে কুরআন তেলাওয়াত করতে দেখা যায়। কুরআন তেলাওয়াতের এক স্থানে এসে সেজদার আয়াত পড়েই মোস্তাহাব সেজদায় লুটিয়ে পড়েন শাহারভি। এ পরিচ্ছন্ন কর্মীর কুরআন তেলাওয়াতের সময় এক ব্যক্তি হাম্মাম খানায় ছিল। সেখান থেকেই তিনি উচ্চ আওয়াজের কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পান। হাম্মাম থেকে ফিরে এসে তিনি দেখতে পান শাহারভি সেজদায় পড়ে আছেন। হাম্মাম খানা (ওজু ও হাজত সম্পন্ন করার স্থান হলো হাম্মাম) থেকে তেলাওয়াত শ্রবণকারী ব্যক্তি তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, " আমি হাম্মামে প্রবেশ করি। সেখান থেকেই আমি শুনতে পাই কে যেন কুরআন তেলাওয়াত করছে। আমি মনে করেছিলাম হয়তো ইমাম মসজিদের ভেতরে কুরআন তেলাওয়াত করছে।"

পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দাবি ও আমাদের সমাজব্যবস্থাঃ

ঝড়-বৃষ্টি, শীত-তাপ উপেক্ষা করে একদল কর্মী রাজধানী শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখেন। গভীর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত নগরীর অলি-গলিতে নির্ভীক সৈনিকের মতো কাজ করেন। কিন্তু এই মানুষগুলোই চরম অবহেলার শিকার। তাদেরকে ন্যায্য পাওনাটুকু দেয়া হয় না। কর্মরত অবস্থায় প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মী মারা যান। অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করে। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করায় ক্যান্সার, চর্মরোগসহ নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে অনেকে। কিন্তু এসব কর্মী বা তাদের পরিবারের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না। একটু সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার আশায় পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা দীর্ঘদিন ধরে কিছু দাবি-দাওয়া জানালেও তাতে কর্ণপাত করছে না দুই সিটি কর্পোরেশন। এক অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৬ সালে অবিভক্ত সিটি কর্পোরেশনের ৮৭৪ জন পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে স্কেলভুক্ত করা হয়েছিল। ওই অফিস আদেশে বলা হয়েছিল, চুক্তিভিত্তিক (কাজ নাই মজুরি নাই) নিয়োগকৃত শ্রমিকরা ১৩ বছর সন্তোষজনকভাবে কাজ করলেই স্কেলভুক্ত হবেন। কিন্তু বিভক্ত সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নির্ধারিত সময়কাল অতিবাহিত হলেও স্কেলভুক্ত করা হচ্ছে না। এছাড়া পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের অবসর সুবিধা, গ্রাচুইটিসহ অন্যান্য সুবিধাও দেয়া হচ্ছে না।

আরও জানা যায়, পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কাছে থেকে পরিচ্ছন্ন শহর গড়তে অনেক আশা করলেও দৈনিক ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রত্যাশিত ঈদ, দুর্গাপূজা, বৈশাখী ভাতা দেয়া হচ্ছে না। এ কারণে তারা মূল বেতনের ন্যূনতম অর্ধেক ভাতা বা বোনাস প্রদান, দুই সংস্থায় নিয়োগকৃত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সন্তানদের জন্য কোটা চালু, কাজের সুবিধার্থে প্রতি ওয়ার্ডে একটি করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী হাজিরা ঘর নির্মাণ করার দাবি জানিয়েছেন সচেতন নাগরিকগণ। এছাড়া পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সহজভাবে করার জন্য প্রতিটি ক্লিনার কলোনিতে পর্যাপ্ত আধুনিক বাসস্থান নির্মাণ, কর্মীদের শীত ও গ্রীষ্মের পোশাক প্রদান, এপ্রোন, রেইন কোট, গামবুট এবং পরিচ্ছন্নতা কাজে ব্যবহৃত মালামাল হাতগাড়ি, টুকরি, বেলচা, কাঁটা ও শলা যথাসময়ে প্রদান করার দাবি তাদের। এর বাইরে বাজার মূল্য বিচার-বিবেচনা করে দৈনিক হাজিরা ৭৫০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা নির্ধারণ এবং নগরীর পরিচ্ছন্নতায় কর্মরত অবস্থায় নিহতদের কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন তারা। আর কর্মরত পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা দুর্ঘটনায় আহত হলে তাদের চিকিৎসার ব্যয় বহনসহ দুর্ঘটনার ধরন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ চান তারা। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য স্কেলভুক্ত বেতন ভাতা,চিকিৎসাভাতা অবসর সুবিধা, গ্রাচুইটি প্রদান করে তাদের নূন্যতম জীবনমান রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

লেখক: কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ,বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

হামাস ঃ মুক্তিকামী মানুষের সাহসী ঠিকানা

মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান

ফিলিস্তিন এক রক্তাক্ত জনপদের নাম। এখানে রক্ত ঝড়ছে সত্তর বছর যাবৎ। মানবাধিকারের ফেরীওয়ালারা ইসরাঈলী বর্বর বাহিনীকে এখানে প্রতিনিয়ত মানবাধিকার লংঘনের জন্য সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে- কখনো প্রকাশ্যে কখনো অপ্রকাশ্যে। নিজ ঘরে ফিলিস্তিনীরা আজ পরবাসী। যাদের এক সময় ঘর ছিল, বাড়ি ছিল, তারা আজ উদ্বাস্তু। সচ্ছল সামর্থবান পরিবারগুলো আজ বস্তি অথবা তাবুর অধিবাসী। নিজ ঘর, নিজ বাড়ি, নিজের চাষাবাদের জমি, আপন দেশ, মাতৃভূমি হারিয়ে আজ তাদের লড়াই করতে হচ্ছে আপন মাতৃভূমির জন্য একদল বিশ্ব সন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে। ইসরাইলীরা প্রতিদিন বিমান, ট্যাংক আর কামান নিয়ে হামলে পড়ছে নিরস্ত্র ফিলিস্তিনী জনগণের উপর। তাদের হামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিহত হচ্ছে নারী ও শিশুরা। পৃথিবীর অধিকাংশ সাধারণ জনগণের বাড়িঘরগুলো বোমা হামলায় মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। অসহায় ফিলিস্তিনীদের চিৎকার আর কান্নায় আকাশ-বাতাস ভারি হচ্ছে। শিশুরা আর নারীরাই যেন ইসরাইলীদের প্রধান টার্গেট। ইসরাইলী এক নারী মন্ত্রী সংসদে প্রকাশ্যে দম্ভোক্তি করে বলেছে 'ওদের নারীদের হত্যা করা হবে যাতে তার আর সন্তান জন্ম দিতে না পারে, ওদের শিশুদের হত্যা করা হবে যাতে তারা বড় হয়ে যোদ্ধা হতে না পারে, ওদের পুরুষদের হত্যা করা হবে যাতে ওরা পরবর্তী বংশবিস্তার করতে না পারে'। যিনি এ বক্তব্য দিয়েছেন তিনি একজন নারী, যে জাতির একজন নারী এ ধরণের বক্তব্য দিতে পারে সে জাতি আসলে কত জঘন্য, কত হিংস্রতা বুঝতে কারো বাকি থাকেনা। ওরা শুধু বাড়িঘরই গুড়িয়ে দিচ্ছেনা, স্কুল, মসজিদ, হাসপাতাল কোনো কিছুই তাদের হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছেনা। আহত মানুষগুলো যখন হাসপাতালের বেডে বসে কাতরাচ্ছে তখন সে হাসপাতালে ওরা আবার বিমান হামলা চালিয়ে তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পৃথিবীর বড় বড় মিডিয়া পশ্চিমা ধনকুবের এবং ইহুদি মালিকানাধীন হওয়ার কারণে ফিলিস্তিনে ইসরাইলী বর্বরতার চিত্র তারা খুব কমই প্রচার করে। এরপরও সোস্যাল মিডিয়ার কারণে ইসরাইলী বর্বরতার সব চিত্র আজ বিশ্ববাসী দেখার এবং জানার সুযোগ পাচ্ছে। পিতার হাতে শিশুর ক্ষয়ে যাওয়া লাশ, মস্তিষ্ক বিকৃত, দেহের অর্ধেক নেই, দেহ উড়ে গেছে শুধু মাথা আছে, অথবা মাথা উড়ে গেছে শুধু দেহ আছে, এভাবে বিভৎস বিকৃত লাশ নিয়ে পিতা-মাতার আহাজারি আমরা প্রতিদিন সোস্যাল মিডিয়ায় দেখতে পাচ্ছি। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের নামকরা মিডিয়াগুলো দায়সারা গোছের রিপোর্ট করে ইসরাইলী বর্বরতা আড়াল করলেও কোনো কিছুই গোপন থাকছে না। শতকরা পচানব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ; এ দেশের মিডিয়াগুলো আধিপত্যবাদী শক্তির দেখানো পথে নিউজ-ভিউজ পরিবেশন করে। তাই আমরা বাংলাদেশের মিডিয়ায়ও ফিলিস্তিনে ইসরাইলী আগ্রাসনের সব খবর পাইনি। তারা দর্শক এবং পাঠক ধরে রাখার জন্য যতোটুকু সংবাদ না দিলেই নয় ততটুকু দায়সারা গোছের সংবাদ প্রচার করেছে। ইতঃপূর্বে জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলে হামলা করার পর ১৩ জন জাতিসংঘ কর্মকর্তা নিহত হলে মিনমিনে কণ্ঠে শুধু একটি প্রতিবাদ জানিয়ে জাতিসংঘ তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছে। জাতিসংঘের বর্তমান ভূমিকাই প্রমাণ করে যে উদ্দেশ্যে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এ প্রতিষ্ঠানটি। জাতিসংঘ জাতিরাষ্ট্রের নয় এখন শক্তিমানদের স্বার্থ রক্ষার প্রতিষ্ঠান। ইসরাইলীদের অন্যায় আগ্রাসন ও ধ্বংসযজ্ঞকে সর্বোৎভাবে সহযোগিতা করছে বৃহৎ এ দুটি রাষ্ট্র। আমেরিকা ও বৃটেনের ইচ্ছার বাইরে কোনো কিছু করার ক্ষমতা জাতিসংঘ হারিয়ে ফেলেছে। ইসরাইল নামক যে রাষ্ট্রটিকে আমেরিকা বৃটেন প্রচ্ছন্ন সাহায্য সহযোগিতা ও মদদ দিচ্ছে সে রাষ্ট্রটির জন্মের মূলত কোনো বৈধতা নেই। আমরা যদি ইসরাইল রাষ্ট্রটির জন্মের ইতিহাস খুঁজি তবে দেখা যায় পৃথিবীতে প্রথম পরমাণু বোমার থিওরী আবিষ্কার করে ইয়াহুদীরা। তাদের কাছ থেকে এ থিওরী কিনে নেয় তৎকালীন পরাশক্তি বৃটেন। এক্ষেত্রে তাদের শর্ত ছিলো তাদেরকে একটি স্বাধীন দেশ দিতে হবে। তারা দাবী জানিয়েছিল 'পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীন আবাসভূমি আছে কিন্তু আমাদের কোনো স্বাধীন আবাসভূমি নেই। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যাযাবর জীবনযাপন করছি আমাদের একটি নিজস্ব ভূমি দিতে হবে'। তাদের এ প্রস্তাবে তৎকালীন বৃটিশ সরকার তাদেরকে বলে তোমরা কোন দেশটি চাও ,তারা প্রথমে চায় আর্জেন্টিনা, বৃটিশরা এটা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদের দ্বিতীয় দাবি ছিল উগান্ডা এটাও অস্বীকার করার পর তৃতীয়বার দাবি করে দক্ষিণ সুদান এরপর দাবি করে ইরিত্রিয়া কিন্তু কোনোটিই বৃটিশরা দিতে রাজি হয়নি, কারণ এগুলো সবই ছিল

বৃটিশ কলোনী। তারা সর্বশেষে ফিলিস্তিন চাইলে বৃটিশরা রাজি হয়, কারণ ফিলিস্তিন ছিল তুর্কি খিলাফতের অধীনে। তৎকালীন অটোম্যান সাম্রাজ্যের কর্ণধাররাও প্যালেস্টাইনকে দিতে অস্বীকৃতি জানালে ইয়াহুদিরা বৃটিশদের পরামর্শে অত্যন্ত সুকৌশলে প্রথমে জমি কেনা শুরু করে। এ জমি কেনায় নেতৃত্ব দেয় মিষ্টার বেলফোর। তারা ১৯২০ সালে জমি কেনা শুরু করে এবং ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়। এভাবে প্রথমে জমি কিনে তারা কিছু লোক বাড়ি করে , পরে আস্তে আস্তে তাদের বসতি যখন বেড়ে যায় তখন তারা ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণা দেয়। এখানে একটি বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেই ইহুদীদের পরামর্শে হিটলার বিশ্ব জয়ের জন্য দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সূচনা করেছিল তাদেরকে হিটলার বিশ্বাস করতে পারেনি। হিটলার প্রায় দশ লক্ষ ইহুদীকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে হত্যা করেছে। কথিত আছে যে হিটলার বলেছিল আমি কেন ইহুদীদের হত্যা করেছি এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্যই কিছু ইহুদীকে জীবিত রেখেছি। যাযাবরের জীবন যাপনকারী একদল সন্ত্রাসীর মূল কর্ণধররা ইসরসাইল রাষ্ট্রটির গোড়াপত্তন করে। ১৯৪৮ সালের আগে ইহুদীদের সন্ত্রাসী সংগঠন ইরগুনজাইলিউমির প্রধান ডেভিড বেলগুরিয়ানকে যে বৃটেন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। সেই সন্ত্রাসী পরবর্তীতে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল এবং তাকেই আবার জাতিসংঘ শান্তি পুরস্কার দিয়েছিল। ইয়াহুদীদের আরো কিছু সন্ত্রাসী সংগঠন আছে, যাদের কাজ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাস পরিচালনা করা, এগুলো হচ্ছে- হাসমুনাইম, আতশম-উত, আল হার হাশেম এবং মোশাদ। যাকে বৃটেন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল তাকেই আবার জাতিসংঘ পুরস্কৃত কোরলো! এতে বোঝা যায় ইসরাইলী সন্ত্রাসের পিছনে জাতিসংঘের প্রচ্ছন্ন মদদ আছে। ইসরাইল-ই পৃথিবীর একমাত্র রাষ্ট্র যার কোনো সীমানা নেই। অবৈধ দখলদারিত্বের মাধ্যমে তারা যতটুকু ভূমি দখল করতে পারে সেখানেই তারা তাদের সীমানা বৃদ্ধি করে। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে নীল নদ হতে ফোরাতকুল পর্যন্ত ইয়াহুদী রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি করা। একদিকে ইসরাইলীদের দখলদারিত্ব বাড়ে অপরদিকে ফিলিস্তিনীদের ভূমি কমে। নিজ ভূমি উদ্ধারের লড়াই করছে ফিলিস্তিনীরা দীর্ঘ সত্তর বছর যাবৎ। পি এল ও শুধু আলোচনা আর সমঝোতার মাধ্যমে ক্ষমতা হাতে পেয়েছে আর বৈদেশিক সাহায্য লোপাট করছে; ফিলিস্তিনী জনতার ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। দখল করা এক খন্ড ভূমিও উদ্ধার হয়নি। থামেনি ইসরাইলী বসতি নির্মাণ। এ প্রেক্ষাপটে হামাসের জন্ম এবং উত্থান। হামাস হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী ইসলামী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ভাবধারায় উজ্জিবীত প্রতিরোধ ও স্বাধীনতাকামী সংগঠনের নাম। একটি রাষ্ট্র যা করতে পারেনি, হামাস তা করেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, বাড়িঘর নির্মাণ মোদ্দা কথা একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যা দরকার সকল আয়োজন তারা সুচারুরূপে করছে। এ সেবার মাধ্যমে তারা জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছে।

পি এলও-র ব্যর্থতার বেলাভূমিতে হামাসের উত্থান ঃ

ইয়াসির আরাফাত ছিলেন আপোসহীন এবং আরাফাতের নেতৃত্বে পিএলও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত পিএলও ছিল দুর্দান্ত এক মিলিট্যান্ট সংগঠন; কিন্তু জাতিসংঘের প্রস্তাবে আরাফাত তথা পিএলও অস্ত্র পরিত্যাগ করে ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি

হামাস হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী ইসলামী সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের ভাবধারায় উজ্জিবীত প্রতিরোধ ও স্বাধীনতাকামী সংগঠনের নাম। একটি রাষ্ট্র যা করতে পারেনি, হামাস তা করেছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, রাস্তাঘাট নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, বাড়িঘর নির্মাণ মোদ্দা কথা একটি রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে যা দরকার সকল আয়োজন তারা সুচারুরূপে করছে। এ সেবার মাধ্যমে তারা জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছে।

আলোচনায় বসে , কিন্তু বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ১৯৯৩ সালে অসলো শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয় ফাতাহ। আর এর বিনিময়ে আরাফাত পান নোবেল পুরস্কার। এই চুক্তি সম্পর্কে ফিলিস্তিনের কণ্ঠস্বর এডওয়ার্ড সাঈদ বলেছেন, "অসলো চুক্তি শুধু ফিলিস্তিনি দুর্বলতার প্রকাশই নয়, বরং বড় ধরণের অযোগ্যতা এবং ভুল হিসাবের কারণে হয়েছে, যার ফলাফল ভয়ঙ্কর হতে পারে। আরাফাত যে একটা ফিলিস্তিন রাষ্ট্র পান নাই, তা বুঝতেও তার এক বছরের মতো সময় লেগেছে। অসলোর গোপন চুক্তি সে করেছে কেবল নিজেকে বাঁচানোর জন্যে। আরাফাত শুধু তার নিজের স্ট্যাটাস সংক্রান্ত প্যারাটাই পড়েছেন। তা পড়েই ভেবেছেন তিনি প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র পেয়ে গেছেন"। এরপর ইসরাইল আলোচনার নামে সময়ক্ষেপন করে ফিলিস্তিনি ভূমি দখল অব্যাহত রাখে আর অবৈধ বসতি স্থাপনের কাজ চলে জোর গতিতে। আলোচনার ফলাফল ফিলিস্তিনি জমিতে নতুন নতুন ইহুদি বসতি। আজকের ফাতাহ শাসিত পশ্চিম তীরে জালের মতো ছড়িয়ে আছে ইহুদি বসতি। ফিলিস্তিনি অঞ্চলগুলো মানে পশ্চিম তীর ও জেরুজালেম অঞ্চল মৌমাছির মৌচাকের মতই ইহুদি বসতিতে ঝাঝরা হয়ে গেছে। পিএলও অস্ত্র পরিত্যাগ করে শান্তি আলোচনায় মনোযোগী হওয়াতে পশ্চিমা নেতাদের বাহবা কুড়ালেও উল্লেযোগ্য কোনো অর্জন করতে না পারায় তখন থেকেই ফাতাহ'র ক্ষয় শুরু আর স্বাভাবিকভাবেই শূন্যস্থান পূরণে উত্থান হতে থাকে ফাতাহ'র চেয়ে আরো সাহসী ও দুর্দান্ত যোদ্ধাদের সংগঠন হামাসের। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইসরাইল এবং জাপান হামাসকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। সৌদি আবর, মিশর, আরব আমিরাতসহ আরো কিছু আরব দেশ হামাস সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবেই বিবেচনা করে। অন্যদিকে ইরান, সিরিয়া, কাতার, তুরস্ক, রাশিয়াসহ বিশ্বের আরো বিভিন্ন দেশ হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন নয় বরং একটি স্বাধীনতাকামী ও প্রতিরোধকামী সংগঠন হিসেবেই দেখে। এমনকি আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জন কেরী হামাসকে একটি রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার আহবান জানিয়েছেন। হামাসের পূর্ণ নাম হচ্ছে 'আল হাব্বাতুল মোকাওয়ামাতুল ইসলামিয়্যাহ'। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ফিলিস্তিনের ধর্মীয় নেতা শেখ আহমেদ ইয়াসিন। শেখ আহমেদ ইয়াসিন ছিলেন একজন পঙ্গু মানুষ এবং ইসরাইলী কারাগারে থাকা অবস্থায় তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তিনি চলাফেরা করতেন হুইল চেয়ারে করে। যখন তার বয়স ১২ বছর তখন তিনি একটা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতিবন্ধী হন। ২০০৪ সালের ২২ মার্চ ভোরে বাসা থেকে ১০০ মিটার দুরের মসজিদে হুইল চেয়ারে করে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। ঐ সময় ৬৪ অ্যাপাচি হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপ করে শেখ আহমেদ ইয়াসিনকে হত্যা করে ইসরাইল। এ সময় তার সঙ্গে থাকা বডিগার্ডসহ আরো ৯জন পথচারী নিহত হন। শেখ আহমেদ ইয়াসিন শহীদ হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ইসরাইল একই প্রক্রিয়ায় হত্যা করে হামাসের সদ্য নতুন প্রধান আব্দুল আজিজ আল রানাতিসিকে।

শারিরীক সক্ষমতা নয় ঈমানই বড় অস্ত্র: শারিরীক সক্ষমতা নয় ঈমানই বড় অস্ত্র এ কথা প্রমাণ করেছেন হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমদ ইয়াসিন। ইসরাইলের অধিকৃত আশকালন শহরের কাছেই এক ছোট গ্রাম আল জুরায় ১৯৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন শেখ আহমদ ইয়াসিন। ১৯৪৮ সালে তাদের গ্রাম ইসরাইলের দখলে চলে গেলে দশ বছরের বালক আহমেদের জায়গা হয় গাজার 'আল সাথি' শরণার্থী শিবিরে। শিবির জীবনের দুবছরের মাথায় যখন তার বয়স মাত্র বারো, বন্ধুর সঙ্গে কুস্তি খেলতে গিয়ে মেরুদন্ডে প্রচন্ড আঘাত পান। টানা ৪৫ দিন তার গর্দান প্লাস্টার করে রেখেও শেষ রক্ষা হয়না। তিনি সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যান। কায়রোর বিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আর অসুস্থতার কারণে তাকে শরণার্থী শিবিরে ফিরে আসতে হয়। তিনি বাড়িতে বসে পড়ে ফেলেন দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি আর ধর্ম, সমাজতত্ত্বসহ পৃথিবীর নানা বিষয়। মসজিদে জুমার নামাজ পড়ানোর জন্য ডাক আসে তার; তার খুৎবা ছিল খুবই জ্ঞানগর্ভ আর দৈনন্দিনে জীবনের সমস্যাকে সহজে তুলে ধরার এক নৈপুণ্যে ভরা শিল্প। মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেসব শুনতো। মানুষ খুজে নিত কোন মসজিদে শেখ আহমদ ইয়াসিন খুতবা দিবে। তার খুতবায় বেশি আকৃষ্ট হতো তরুণরা। কুরআন হাদিসের আলোকে বর্তমানের সাথে মিলিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি আর আধুনিক মনস্ক কথা-বার্তায় তরুণরা হতো উজ্জিবীত। যেখানেই তার বক্তৃতা সেখানেই মানুষের ঢল। কিন্তু খুতবা দিয়ে অথবা বক্তৃতা দিয়ে আমাদের দেশের মৌলভী সাহেবদের মতো অর্থ কামাই তার জ্ঞান এবং রুচি বিরুদ্ধ কাজ। বক্তৃতা, খুৎবায় মানুষর ঢল নামলে পেট চলে না, পেট চালানোর জন্য চাই একটা চাকরি বা ব্যবসা। শেষ পর্যন্ত এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পেশাকে বেছে নেন নিজের জীবনের জন্য। স্কুলের হেড মাস্টার মোটেও রাজি ছিলেন না। কিন্তু পরে বিস্ময়ের সাথে তিনি লক্ষ্য করেন, ছাত্রদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক, পরম আপনজন। শুধু ক্লাসে নয়, ছাত্ররা তার পিছু পিছু মসজিদেও যেতে থাকে। অনেক অভিভাবকের আপত্তি ছিল ক্লাসের বাইরে তাকে অনুসরণের ক্ষেত্রে। কিন্তু তিনি ক্রমশই সবাইকেই তার অনুরাগী করে তোলেন। অনেকের মতে অন্যের কষ্ট অনুধাবনের এক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তার। আসলে তিন বছর বয়সে পিতা হারিয়ে দশ বছর বয়সে শরণার্থী হয়ে- বারোতে এসে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে তিনি এতোটাই জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন যে, তাকে এক কথা দুবার বলতে হতো না। অনেক সময় বলতেই হতো না। তিনি বুঝে নিতেন মুখ দেখে। তারপর ছিল তার অপরিসীম জ্ঞান আর আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা। এই জ্ঞানটাই তিনি ব্যবহার করেছেন হামাসকে সংগঠিত করার সময়। মানুষের কোনো প্রয়োজনটি আগে? শরণার্থী শিবিরের শিশুরা যেন মানবসম্পদে পরিণত হতে পারে, সেটা তিনি দেখান তার মূল লক্ষ্য হিসেবে। স্কুল, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ, সঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, আর সেগুলোকে সবার সমান নাগালে রাখা হয়ে ওঠে হামাসের মূল কাজ। মানুষ কাছে টেনে নেয় হামাসকে। ততোদিনে ইয়াসির আরাফাতের আল-ফাতাহ আর সব সংগঠনকে নিয়ে গড়ে তোলা পিএলও মানুষের কাছ থেকে অনেক দুরে সরে গিয়েছে। আকণ্ঠ দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে পরে পিএলও সরকারের মন্ত্রিরা। অসলো চুক্তির পর পিএলও পশ্চিম তীরে ফিরে আসার সুযোগ পায়, সঙ্গে আসতে থাকে কাড়ি কাড়ি টাকা। সৌদি, কুয়েতি, কাতারি ছাড়াও ইউরোপীয় ইউনিয়ন নরওয়ে, সুইডেন থেকে টাকা আসে পূণর্গঠনের জন্য। সেসব টাকা শেষ পর্যন্ত মানুষের কাজে লাগেনি; দুর্নীতিতে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া পিএলও আর তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর হোমরাচোমরারা সব লোপাট

করে। এসব দুর্নীতি আর ব্যর্থতার বেলাভূমিতে ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে শেখ আহমদ ইয়াসিন গঠন করেন হামাস।

রাষ্ট্র যা পারেনি একটি সংগঠন তা করে দেখিয়েছে ঃ পিএলও- কে জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেয়ার পর মানুষ ভেবেছিল তা ফিলিস্তিন পুণর্গঠনে ভূমিকা রাখবে কিন্তু এ কাজে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থতা, অযোগ্যতা এবং অবহেলার পরিচয় দিয়েছে। ইসলামী সংগঠন হামাস মানুষের ব্যক্তিগত আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে গড়ে তোলে পূণর্গঠন তহবিল। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফিলিস্তিনিরা এবার তাদের দান পাঠাতে থাকে হামাসের ঠিকানায়। হামাস প্রতিটা পাই পয়সার হিসাব রাখে সর্বাধিক স্বচ্ছতা আর দক্ষতার সঙ্গে। শক্ত সামাজিক সংগঠন হওয়ায় আর ইসলামী আদর্শকে ধারণ করে নৈতিকতার সর্বোচ্চ ইসলামী মান তারা রক্ষা করে। এটাই আমানতদারীতা, তাক্বওয়া ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব নমুনা। ইসরাইলের অবরোধ কাটিয়ে গাজার লোকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেসব গোপন সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করা হয়েছিলো, তার সবগুলোতেই ছিল হামাসের বুদ্ধি, জ্ঞান আর অর্থ। অবরুদ্ধ আর যুদ্ধবিদ্ধস্ত এক টুকরা বসতিকে সস্তায় বিনোদনের সুযোগ তৈরীর জন্য হামাসের তৈরী পার্ক, বাগান, খেলার মাঠ, ফুটবল ময়দান, চিড়িয়াখানা, রেস্তোরা বিনোদনের পাশাপাশি অনেক মানুষের কাজের সুযোগ তৈরী করেছে।

হামাসের উত্থান মানতে পারছেনা মুসলিম নামধারী পশ্চাত্যের সেবকরা ঃ গাজার উপকুলে পাওয়া গ্যাস হামাসের কব্জায় চলে গেলে এবং হামাসের 'ন্যায়নীতির প্রশাসন চালু রাখলে' মিশরের বিধ্বস্ত অর্থনীতি আর সামরিক শাসন বেশিদিন টিকতে পারবে না। মিশরের জন্য আবার রাবা স্কয়ারে জমা হবে অজুত জনতা আবার গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হবে। অতএব মিসরের সামরিক জান্তারা টিকবে না। সিসিকে জনগণ ক্ষমতায় রাখতে চাইবে না। এটা আর কেউ না বুঝলেও অবৈধ শাসক সিসি ভালো করেই বোঝে। সৌদি রাজ পরিবার কোনো অবস্থাতেই কোনো আরব দেশে গণতন্ত্র আর আইনের শাসন দেখতে চায় না। অতএব তারাও হামাসকে পছন্দ করে না। শুধু সৌদি আর ও মিশরই নয় কোনো আরব রাষ্ট্রই সত্যিকার আন্তরিকতা নিয়ে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে আসেনি। শিয়া হওয়ার পরেও ইরান যেভাবে ফিলিস্তিনি জনতার পক্ষে কথা বলে তা অন্য কেউ করে না। ইসরাইলের সাথে রাজনৈতিক যোগাযোগ থাকা সত্বেও তুরস্ক বরাবর ইসরাইলী বর্বরতার বিরোধীতা এবং গাজার জনগণের জন্য সাহায্য সরবরাহ করে আসছে। অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলো সে তুলনায় খুব কমই ভূমিকা রাখছে। হামাসকে ইতঃমধ্যেই সিরিয়া থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। হামাস নেতারা এখন থাকেন কাতারে। সবাই ভাবছেন, হামাসকে খতম করে আবার ফাতাহ ইসরাইলের মাধ্যমে গাজাকে গড়ে তুলবে। ইসরাইলের বংশধরদের নেতৃত্ব থাকবে সেখানে। কিন্তু যাদের সম্পর্ক মাটি ও মানুষের সাথে, যাদের শিকর মাটির গভিরে গ্রোথিত। যারা আরশের মালিকের সাহায্য ছাড়া আর কারো সাহায্যের উপর ভরসা করে না তাদের এভাবে ধ্বংস করা যায় না।

চলবে......

লেখক: কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক
ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

ইসলামী সংগঠন হামাস মানুষের ব্যক্তিগত আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে গড়ে তোলে পূণর্গঠন তহবিল। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ফিলিস্তিনিরা এবার তাদের দান পাঠাতে থাকে হামাসের ঠিকানায়। হামাস প্রতিটা পাই পয়সার হিসাব রাখে সর্বাধিক স্বচ্ছতা আর দক্ষতার সঙ্গে। শক্ত সামাজিক সংগঠন হওয়ায় আর ইসলামী আদর্শকে ধারণ করে নৈতিকতার সর্বোচ্চ ইসলামী মান তারা রক্ষা করে। এটাই আমানতদারীতা, তাক্বওয়া ও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব নমুনা। ইসরাইলের অবরোধ কাটিয়ে গাজার লোকদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য যেসব গোপন সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করা হয়েছিলো, তার সবগুলোতেই ছিল হামাসের বুদ্ধি, জ্ঞান আর অর্থ। অবরুদ্ধ আর যুদ্ধবিদ্ধস্ত এক টুকরা বসতিকে সস্তায় বিনোদনের সুযোগ তৈরীর জন্য হামাসের তৈরী পার্ক, বাগান, খেলার মাঠ, ফুটবল ময়দান, চিড়িয়াখানা, রেস্তোরা বিনোদনের পাশাপাশি অনেক মানুষের কাজের সুযোগ তৈরী করেছে।

সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে চাতাল শ্রমিকের ভূমিকা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ড. মোঃ জিয়াউল হক

ভূমিকা

সমগ্র বিশ্বব্যাপি মানবতার কল্যাণে ইসলামই একমাত্র রোল মডেল। সকল শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য ও নিরাপত্তার প্রতীক এবং সুমহান আদর্শ। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গঠনের মানদণ্ড। মানুষের জীবন গঠনে খাবারের ভূমিকা খুবই স্পষ্ট। আর আত্মা ও দেহ রুগ্ন হয়ে উঠলে মানুষ হারিয়ে ফেলে নিজের আসল পরিচয়। জীবন হয়ে ওঠে মরীচিকাময়। তাই ইসলাম খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়জাত করণে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। একাজে চাতাল শ্রমিকদের ভূমিকা অগ্রণী। বাংলাদেশের ১০টি শিল্প খাতের মধ্যে চালকল বা চাতাল শ্রমিক সেক্টর অন্যতম। এ খাতের শ্রমিকদের মাধ্যমেই আমরা পেয়ে থাকি মোটা চিকন সুগন্ধিময় চাল। মাঝারি শিল্পের এ খাতে যারা কাজ করে তারা চাতাল শ্রমিক হিসেবে পরিচিত।

চাতাল শ্রমিকের পরিচয়

বাংলাদেশ একটি কৃষিনির্ভর দেশ। যে দিকে চোখ যায় কেবল ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। ব্যাপক ধান উৎপাদন হওয়ায় এদেশে চালকলও গড়ে উঠেছে অনেক। আর এসব চালকলে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন প্রচুর শ্রমিক। উত্তপ্ত রোদে মানুষ যখন বাইরে যেতে ভয় পান বা ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেন। তখনই একদল শ্রমিককে খালি পায়ে ইট-পাথরের চাতালে ধান শুকাতে দেখা যায়। মূলতঃ এদেরকে বলা হয় চাতাল শ্রমিক।

চাতালে ধান প্রক্রিয়াকরণের ধারা বহু বছরের। বেসরকারি হিসাবে, দেশে চাতাল আছে প্রায় ৪০ হাজার। এতে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক শ্রমিক কাজ করেন। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশই নারী শ্রমিক। তবে সরকারি হিসাবে চাতালের সংখ্যা ১৬ হাজারের কিছু বেশি। ধান সংগ্রহের পর, পানিতে ভেজানো, সেদ্ধ করা, রোদে শুকানো, আরও কয়েকটি ধাপ শেষে আপনার বাসায় চাউলের বস্তা রুপে চলে যায় চাল। প্রচন্ড রোদে একদল শ্রমিক ধান শুকানোর কাজ করেন, এদের যে নেতৃত্বদেন তাকে স্থানীয় ভাষায় "বহরদার "(দল নেতা) বলা হয়। ইদানিং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে এ শিল্পেও এর কিছুটা ছোয়া লেগেছে, হয়েছে সেমি অটো মিল, ফুল অটো মিল, অটো ড্রায়ার মিল, রাইচ প্রসেসিং মিল সহ ইত্যাদি।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ ও সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে চাতাল শ্রমিকের অবদান

বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য হলো চাল। এই চাল প্রস্তুত করে চাতাল শ্রমিকেরা। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করে চলাফেরার সুযোগ দেওয়ার পর থেকে মানুষ দেহের চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) সৃষ্টির পর তারা খাবারের চাহিদা পূরণ করতেই আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছেন। তাই মানবজীবনে শৃঙ্খলা তৈরিতে খাদ্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, ইতঃপূর্বে আমি আদমের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, সে তা ভুলে গিয়েছিল, আমি তাকে দৃঢ় সংকল্পরূপে পাইনি। (সূরা ত্বহা : ১১৫)

পৃথিবীতে মানব বসতি গড়ে ওঠার পর থেকে খাদ্যের চাহিদা পূরণের চেষ্টা চলছে। তাই যে কোনো স্থানে বসবাসের উপযুক্ততা নির্ভর করে খাদ্যের পর্যাপ্ততার ওপর। প্রাচীনকাল থেকে খাদ্যের অভাব পূরণে গড়ে ওঠে কৃষি ব্যবস্থা। সূরা জুমুআর ১০নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যখন নামাজ শেষ হয়ে যায় তখন তোমরা জীবিকা অন্বেষণে (কাজ-কর্মের জন্য) পৃথিবীতে ছড়িয়ে পর।' খাদ্য উৎপাদন করা রাসূল

(সা.) এর আদর্শও বটে। কোনো ভূমি যেন পরিত্যক্ত বা অনাবাদি না থাকে, সে জন্য তিনি বলেছেন, 'তোমরা জমি আবাদ কর আর যে ব্যক্তি নিজে আবাদ করতে না পারে, সে যেন ভূমিটিকে অন্য ভাইকে দিয়ে দেয়, যাতে সে আবাদ করে ভোগ করতে পারে।' কুরআনে এসেছে-'তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্টজীবের জন্য। এতে আছে ফলমূল আর রসযুক্ত খেজুর বৃক্ষ এবং খোসাবিশিষ্ট দানা ও সুগন্ধি গুল্ম।' (সূরা আর-রহমান :১১-১২)

কৃষি বিজ্ঞানের যাবতীয় শিক্ষায় সুশিক্ষিত হজরত আদম (সা.) পৃথিবীতে এসে প্রথম স্বহস্তে কৃষি কাজ করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করেছেন। অনেক সাহাবিকে (রা.) তিনি খাদ্য উৎপাদনের কাজে উৎসাহিত করেছেন। হজরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা জমিনের প্রচ্ছন্ন ভাণ্ডারে খাদ্য অন্বেষণ কর।' কুরআন ও হাদিসের আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে, ইসলাম খাদ্যশস্য উৎপাদনে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। খাদ্য উৎপাদন, সরবরাহ বৃদ্ধি ও সার্বিক নিরাপত্তায় নিত্যনতুন কাজ করা অতীব জরুরি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে অধীন করেছেন, অতএব তোমরা এর ওপর চলাচল কর এবং তার প্রদত্ত রিজিক গ্রহণ কর, তার কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।' (সূরা মূলক : ১৫)।

খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গৃহীত পদক্ষেপ ছিল ইতিহাসের যুগান্তকারী একটি ঘটনা। তৎকালীন মিসরের বাদশাহর স্বপ্নযোগে দেখা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তিনি এক অনবদ্য নীতিমালার উদ্ভাবন করেন। ঐ সময়ে পরিকল্পিতভাবে পর্যাপ্ত চাষাবাদের মাধ্যমে আসন্ন খাদ্যের ঘাটতি ও অভাব দূর করেছিলেন তিনি। তার উদ্ভাবিত খাদ্যের জোগান, ব্যবহার ও সুষম বণ্টন নীতি আজও অনুসরণযোগ্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে, আর ফসল কাটার সময় খাওয়ার সামান্য পরিমাণ ছাড়া বাকিগুলো শীষের ভেতরে রাখবে। এরপর কঠিন সাত বছর আসবে, তখন মানুষ তোমাদের জমা করা খাবার খাবে, তবে এর থেকে সামান্য তোমরা সংরক্ষণ করবে।' (সূরা ইউসুফ: ৪৭-৪৮)

কুরআনুল কারীম, হাদীস ও ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে কথা প্রতীয়মান হয় তা হলো, মানব সৃষ্টির পর জান্নাত (আদম ও হাওয়া) থেকে দুনিয়ায় অদ্যাবধি পর্যন্ত মানুষের প্রথম চাহিদা হলো খাদ্যের। পেটে খাবার না থাকলে মানুষ কোন আইন মানতে পারে না। তারা খাদ্যাভাবে হয়ে উঠে বেপরোয়া, উশৃঙ্খল এবং জড়িয়ে পরে সন্ত্রাসি কর্মকান্ডে। অশান্তির দাবানলে জ্বলতে থাকে জাতি।

বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদন ও প্রস্তুত করণে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। ধান সংগ্রহের পর, পানিতে ভেজানো, সেদ্ধ করা, রোদে শুকানো, আরও কয়েকটি ধাপ শেষে চাল বস্তায় ভর্তি তারাই করে থাকেন। দেশের প্রায় ১৭ হাজার এরও বেশি চাতালের প্রায় ৫ লক্ষাধিক শ্রমিকেরা যদি চাল প্রক্রিয়াজাত ও প্রস্তুতকরণের কাজ না করেন তাহলে এ দেশের মানুষ খাদ্যাভাবে নিপতিত হবে। আর তখনই দেশের মধ্যে সৃষ্টি হবে নানা রকম অরাজকতা। বেকায়দায় পরবে সরকার। শান্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে দেশে। তাই খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং সুশৃঙ্খল জাতি গঠনে চাতাল শ্রমিকদের ভূমিকা অপরিসীম।

উত্তপ্ত রোদে খালি পায়ে ইট-পাথরের চাতালে ধান শুকাতে হয় চাতাল শ্রমিকদের। প্রচণ্ড রোদ মাথায় নিয়ে দিনভর শ্রম দিতে হয় তাদের। কিন্তু, আয়-রোজগার যা হয় তা দিয়ে সংসার চালানো দায়। পরিশ্রমে ঘাম ঝরে শরীর থেকে। ভিজে যায় জামা-লুঙ্গি। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে হয় বার বার। শরীরের ঘাম শরীরে মিলে যায়। ক্লান্ত-শ্রান্ত তবুও ধান শুকাতে ব্যস্ত চাতাল শ্রমিকরা। কখনো কখনো ক্লান্তি দূর করতে চলে যায় গাছতলায়। এতো শ্রম দিয়ে দিনে মাইনে পান মাত্র ৪০০ টাকা।

কেমন আছেন চাতাল শ্রমিকেরা?

উত্তপ্ত রোদে খালি পায়ে ইট-পাথরের চাতালে ধান শুকাতে হয় চাতাল শ্রমিকদের। প্রচণ্ড রোদ মাথায় নিয়ে দিনভর শ্রম দিতে হয় তাদের। কিন্তু, আয়-রোজগার যা হয় তা দিয়ে সংসার চালানো দায়। পরিশ্রমে ঘাম ঝরে শরীর থেকে। ভিজে যায় জামা-লুঙ্গি। গামছা দিয়ে মুখ মুছতে হয় বার বার। শরীরের ঘাম শরীরে মিলে যায়। ক্লান্ত-শ্রান্ত তবুও ধান শুকাতে ব্যস্ত চাতাল শ্রমিকরা। কখনো কখনো ক্লান্তি দূর করতে চলে যায় গাছতলায়। এতো শ্রম দিয়ে দিনে মাইনে পান মাত্র ৪০০ টাকা।

গত বছরের মতো এবারও লকডাউনের শুরু থেকে শ্রমজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে।, চাতাল, শ্রমিকসহ প্রায় সব পেশার শ্রমিকরাই আজ বেকার। এসব শ্রমিকের বেশির ভাগই দিন আনে দিন খায় ভিত্তিক শ্রমিক। তাদের উপার্জনের ওপরই তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ভর করে। কর্মহীন হয়ে পড়ায় পরিবার-পরিজনসহ এসব শ্রমিক অর্ধাহারে-অনাহারে দিন যাপন করছে।

চাতাল শ্রমিকদের প্রাপ্ত তথ্য মতে, তাদের কাজে আসতে হয় ভোরবেলা। বাড়িতে ফিরতে হয় রাত ১০টা বা ১১টার দিকে। ভোর থেকে ধান সেদ্ধ, সকাল থেকে ধান শুকানো আর সন্ধ্যায় ধান ঘরে তোলা ও ওজন দিতে হয়। দেশের ৫০০০টি ধান চাতালের প্রত্যেকটিতে ১০ থেকে ১৫ জন করে শ্রমিক রয়েছেন। ঘর্মাক্ত শ্রমের চাতাল শ্রমিকরা বরাবরই ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। শ্রম আইন অনুযায়ী পারিশ্রমিকের দাবি করে আসছেন তারা। অদ্যাবধি ন্যায্য মজুরির ইতিবাচক কোনো সাড়া পাননি তারা। অথচ চাতাল শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত একটি শিল্প। কিন্তু এ খাতে শ্রম আইনের একটি ধারাও মানা হয় না। চাতালের শ্রমিকেরা শ্রমিক হিসেবেই স্বীকৃত নন। এ খাতে সরকার বাহাদুরেরও নেই কোনো নজরদারি। মালিকরা মনে করে থাকেন, ‘এ খাতের শ্রমিক চুক্তিভিত্তিক। ওরা তো শ্রমিকই না। তাই এদের বেলায় শ্রম আইন প্রযোজ্য না।’ তবে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) তথ্য মতে, শ্রম আইন অনুযায়ী চাতাল একটি কারখানা। এখানকার শ্রমিকেরা মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হবেন। এই শ্রমিকদের যা প্রাপ্য তা দিতে হবে। তবে এ খাতে শ্রম আইনের কিছুই মানা হয় না। সরকারের কোনো পরিদর্শক দলও এ শিল্প পরিদর্শন করেন না।

২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং পরে সংশোধিত আইনটিতেও চাতালশিল্পের কথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে চাতাল শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয় ৪৯৫ টাকা। এর পর আর মজুরি পুনঃনির্ধারণ করা হয়নি। চাতালে রোদে পুড়ে, আগুনের তাপে, ধুলা-ময়লায় কাজ করেও শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতির কথা ভাবতেই পারেননা তারা। কাজ করে মজুরি পেয়েই তাঁরা খুশি।

কেমন আছেন নারী চাতাল শ্রমিকেরা?

দেশের চাতাল শ্রমিকের মধ্যে ৬৫ শতাংশই নারী শ্রমিক। ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় বেশি পরিশ্রম করেন নারী শ্রমিকরা। তবুও নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে মজুরি বৈষম্য। নারী শ্রমিকরা মজুরি পান পুরুষ শ্রমিকের অর্ধেক। জীবিকার তাগিদে এই বৈষম্য স্বীকার করেই কাজ করেন চাতালের নারী শ্রমিকরা।

এদিকে চাল কলে নারী শ্রমিকরা অধিকাংশ স্বামী পরিত্যক্তা ও বিধবা। তাই নিরুপায় হয়ে চালকলে তারা কাজ করে থাকেন। তবে আলো-বাতাসহীন ছোট খুপড়ি ঘরে গরমে কষ্ট করে থাকেন এসব শ্রমিক। ফলে অধিকাংশ শ্রমিক অসুস্থতায় ভোগেন। খাবারও স্বাস্থ্যসম্মত না। চাতাল শ্রমিকদের ‘একচাতাল’ বা ‘একদাগ’ হিসেবে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এক চাতালে ২০০ থেকে ৩০০ মণ ধান সেদ্ধ করা হয়। এক চাতাল ধান সেদ্ধ, চাল উৎপাদন এবং বিপণন পর্যন্ত সময় লাগে দুই-তিন দিন। আবহাওয়া খারাপ থাকলে পাঁচ-সাত দিন লেগে যায়। চাতালে পুরুষ শ্রমিকদের একদাগ (দুইদিন) হিসাবে মজুরি দেওয়া হয় ৮০০ টাকা। এ হলো পুরুষ শ্রমিকের কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের কোনো টাকা

এক চাতালে ২০০ থেকে ৩০০ মণ ধান সেদ্ধ করা হয়। এক চাতাল ধান সেদ্ধ, চাল উৎপাদন এবং বিপণন পর্যন্ত সময় লাগে দুই-তিন দিন। আবহাওয়া খারাপ থাকলে পাঁচ-সাত দিন লেগে যায়। চাতালে পুরুষ শ্রমিকদের একদাগ (দুইদিন) হিসাবে মজুরি দেওয়া হয় ৮০০ টাকা। এ হলো পুরুষ শ্রমিকের কথা। কিন্তু এক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের কোনো টাকা দেওয়া হয় না। একদাগ হিসাবে তারা জনপ্রতি ১৫ কেজি খুদ ও ১৫ কেজি ধানের গুঁড়া পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়ে থাকেন। বাজারদর হিসেবে ওই পরিমাণ খুদ ও গুঁড়ার মূল্য ৪৫০ টাকা। আজকের এই বিশ্বে, সভ্যতার এই পর্যায় এসে এমন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বৈষম্যের শিকার নারী চাতাল শ্রমিকরা।

দেওয়া হয় না। একদাগ হিসাবে তারা জনপ্রতি ১৫ কেজি খুদ ও ১৫ কেজি ধানের গুঁড়া পারিশ্রমিক হিসেবে পেয়ে থাকেন। বাজারদর হিসেবে ওই পরিমাণ খুদ ও গুঁড়ার মূল্য ৪৫০ টাকা। আজকের এই বিশ্বে, সভ্যতার এই পর্যায় এসে এমন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বৈষম্যের শিকার নারী চাতাল শ্রমিকরা।

চাতাল শ্রমিকদের সমস্যা

অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা এ খাতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। যেহেতু তাদের শ্রম আইনের আওতা বহির্ভূত মনে করা হয়, সে কারণে অনেক ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত হয় নূ-ন্যতম অধিকার থেকেও। এ সমস্যা গুলোর মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে:

১) কর্মঘণ্টা: বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক দৈনিক আট ঘণ্টার বেশি সময় কাজ করতে পারবেন না বা তাঁকে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনও নিয়ম নীতির বালাই নেই। কাজ করতে হয় ৮ ঘণ্টা থেকে অনেক বেশি। তার বিনিময়ে বাড়তি কোনও মজুরি দেওয়া হয় না। শ্রমিক অধিকার নিয়ে কাজ করা বেসরকারি সংগঠন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) গবেষণায় ভয়াবহ একচিত্র ফুটে উঠেছে: দেশের চাতালে কর্মরত ৪২ শতাংশের বেশি শ্রমিক দৈনিক ১০ থেকে ১১ ঘণ্টা কাজ করেন। ১২ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন ৪০ শতাংশ শ্রমিক। বাকিদের ১১ থেকে ১২ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হয়। গবেষণায় দেখা গেছে ২৫ শতাংশের বেশি শ্রমিক নিয়মিত কর্মবিরতি ছাড়াই কাজ করেন।

২) নিয়োগ পত্র: বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিয়োগ পত্র দেওয়া হয় না। যে কারণে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়, ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে বা বিনা নোটিশে বরখাস্ত করা হয় নিরীহ শ্রমিকদের।

৩) ন্যূনতম মজুরি: মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই তাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শ্রমিকরা বঞ্চিত হন। কোনো কোন ক্ষেত্রে অবস্থা দারুণ নাজুক। চালকল শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের প্রাপ্ত মজুরি ভয়াবহ রকমের কম।

৪) অনিরাপদ কর্ম পরিবেশ: বেশ ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করতে হয় এ খাতে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিককে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কঠোর পরিশ্রম করার ফলে এ খাতের শ্রমিকেরা অল্প বয়সেই অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা হারান। এ খাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বলতে কিছুই নেই। চাতালে কাজ করতে করতে শ্রমিক মারা গেলেও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেই। ১৯২৩ সালের বয়লার আইন চাতালের জন্য প্রযোজ্য হলেও তা মানা হয় না। মালিকেরা এ ধরনের দুর্ঘটনার দায় চাপান শ্রমিকদের ঘাড়েই। ফলে একের পর এক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে চালকল শ্রমিকরা।

৫) সুরক্ষা সুবিধা: চিকিৎসা সেবা অবসর পরবর্তী ভাতা যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি বা পেনশন এর মতো সুরক্ষা সুবিধা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই থাকে অনুপস্থিত।

৬) মাতৃত্বকালীন সুবিধা: চাতালের নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির বালাই নেই। নেই নারী শ্রমিকদের সঙ্গে থাকা ছোট সন্তানদের জন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা।

সরকারের নিকট সুপারিশ

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন পরিবেশ সুরক্ষায় এবং অর্থনৈতিক উন্নতির ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে চাতাল খাতের প্রতি সরকারের অনতিবিলম্বে সুদৃষ্টি দিতে হবে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসতে হবে অতি গুরুত্বপূর্ণ এ খাতকে। সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি আইনি কাঠামো যার মধ্যে দিয়ে স্বীকৃতি মিলবে এ খাতের এবং একই সঙ্গে এ খাতে কর্মরত বিপুল সংখ্যক শ্রম শক্তির ন্যূনতম অধিকার নিশ্চিত করতে যা পালন করবে রক্ষাকবচের ভূমিকা।

এ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী :

১. চাতাল শ্রমিকদের জন্য আলাদা মজুরি বোর্ড গঠন করা ও তা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য দূর করা।

২. চাতাল শ্রমিকদের জন্য নিয়োগ, যোগদানপত্র এবং পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা করা।

৩. চাতাল শ্রমিকদের কাজের নির্ধারিত কর্মঘন্টা নির্ধারণ করা এবং ৮ ঘন্টার অধিক কাজের জন্য ওভার টাইম ধরে মজুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪. চাতালগুলো পরিবেশ বান্ধব ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৫. সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ছুটি এবং ঈদ বোনাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি ভাতার ব্যবস্থা করা ।

৭. চাতাল শ্রমিকদের জন্য সহজ শর্তে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুবিধা প্রদান করা।

৮. চাতাল শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকল্পে কর্ম এলাকায় থাকার জন্য আবাসন সুবিধাসহ আলাদা স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করা।

১০. শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অটোমিল শ্রমিকসহ সকল চাতাল শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

১১. স্বাস্থ্য বীমা, অবসর পরবর্তী ভাতা যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি বা পেনশন এর মতো সুরক্ষা সুবিধা চালু করা।

১২. কার্যকরি প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে সুদ মুক্ত ঋণ প্রদান, বিভিন্ন ধরণের আর্থিক এবং প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

উপসংহার

শ্রমজীবী মানুষ যেহেতু দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি, তাই মহামারি পরিস্থিতিতে পরিবার-পরিজনসহ তাদের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চিত করা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

চাতাল শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মস্থল, শোভন কাজ ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে পারলে, দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সংগতি রেখে ভ্যারিয়েবল ডিএ প্রদান করা ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ও একটি কল্যাণ রাষ্ট্র কায়েমের জন্য অপরিহার্য দাবি। নারী শ্রমিকদের সমমজুরি, সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তা, শিশু যত্নাগার ও প্রসূতিকালীন ছুটি নিশ্চিত করা একান্ত কর্তব্য। এলাকাভিত্তিক সুলভ মূল্যে বাসস্থান এবং বিনা মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে চাতাল শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সময়ে দাবি।

লেখক:- সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন ও সভাপতি , বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন,নাটোর জেলা

শ্রমআইনে ছুটির নীতিমালা

এ্যাডভোকেট মোঃ জাকির হোসেন

ভূমিকাঃ প্রতিটি শিল্প কারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিটি কারখানায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত শ্রম আইন ছাড়াও কারখানা কর্তৃপক্ষের নিজস্ব নীতিমালা থাকে। এ নীতিমালায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত সুযোগ-সুবিধাসহ আরও কিছু সুযোগ/সুবিধা দেয়া হলে তার উল্লেখ থাকে। শিল্প কারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে তাই একটি সুষ্ঠু নীতিমালা থাকা একান্ত আবশ্যক। সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকলে কারখানা পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম-নীতির মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হলে সেখানে সুষ্ঠ শ্রম পরিবেশ বজায় থাকে, এতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। একই সাথে শ্রমিকদের স্বার্থও রক্ষা পায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শ্রমিকদের ছুটি এবং এ বিষয়ক অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ছুটি সংক্রান্ত নীতিমালার প্রয়োজনীয়তাঃ

প্রতিটি মানুষেরই নিজস্ব একটি সত্ত্বা আছে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে তাকে থাকতে হয়। এ ক্ষেত্রে কিছু সামাজিক দায়িত্ব ও তাকে পালন করতে হয়। একটি যন্ত্র যেমন চালু করা হলে তা বন্ধ না করা পর্যন্ত চলতে থাকে। তাই মানুষের কাজের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এখন থেকে শত বর্ষেরও অধিক সময় পূর্বে সিকাগোর 'হে' মার্কেটে শ্রমিকরা দৈনিক ৮ (আট) ঘন্টা কর্ম সময় দাবী করে আন্দোলন করে। এই আন্দোলনের ফলে বিশ্ব ব্যাপী দৈনিক ৮ (আট) ঘন্টা শ্রম সময় এবং বাকি সময় বিশ্রামের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় কাজ করার পর নির্দিষ্ট সময় ছুটি বা বিশ্রাম হিসাবে শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষনের বিষয়টি বহু পূর্ব থেকেই স্বীকৃত হয়ে আসছে। এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ সকল মহলে স্বীকৃত। তাই বাংলাদেশ সরকার এ প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করে শ্রমিক কর্মচারীদের ছুটি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিল্প কারখানায় যে রূপ ছুটি প্রদানের বিধান, নিয়ম-নীতি রয়েছে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও ২০১৩ সংশোধনীতে ছুটি প্রদানের নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। শ্রমিকগণ যে সব ধরনের ছুটি ভোগ করতে পারবে তা নিম্নরূপঃ

ছুটির প্রকারভেদঃ

১. নৈমিত্তিক ছুটি (casual leave)
২. অসুস্থতাজনিত ছুটি (sick leave)
৩. মাতৃত্বকালীন ছুটি (Maternity benefit)
৪. সাপ্তাহিক ছুটি (weekly holiday)
৫. উৎসব ছুটি (Festival holiday)
৬. মজুরীসহ বার্ষিক ছুটি (Annual leave with wages)
৭. স্বল্পকালীন ছুটি।
৮. ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি (Compensatory weekly holiday)

১. নৈমিত্তিক ছুটিঃ (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধিত ২০১৩, ধারা ১১৫ অনুযায়ী) প্রত্যেক শ্রমিক প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে পূর্ণ মজুরীতে ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি পাইবার অধিকারী হইবেন এবং উক্তরূপ ছুটিকোন কারণে ভোগ না করলে উহা জমা থাকবে না এবং কোন বৎসরের ছুটি পরবর্তী বৎসরে ভোগ করা যাইবে না। কোন শ্রমিকের হঠাৎ ছুটির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এ ধরণের ছুটি মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। এই ছুটি এক সাথে ০৩ দিনের বেশি মঞ্জুর করা হয় না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এর অধিক পরিমাণ ছুটি শ্রমিককে মঞ্জুর করে থাকে। নৈমিত্তিক ছুটির জন্য শ্রমিকেরা পূর্ণ হারে বেতন পেয়ে থাকে। প্রত্যেক কর্মচারী/শ্রমিক বছরে পূর্ণ বেতনসহ ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করতে পারবেন নিম্নলিখিত শর্তের উপর-

ক. নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ না করলেও পরবর্তী বছরে এই ছুটি যোগ হবে না। অর্থাৎ প্রতি বছরের ৩১শে ডিসেম্বর এর পর এই ছুটি বাতিল হয়ে যাবে।

খ. ছুটিকালীন সময়ের সাথে যদি কোন সাপ্তাহিক ছুটি বা কোন পর্বজনিত ছুটি পড়ে তাহলে তা ঐ ছুটির সাথে যোগ হবে না।

গ. নিয়োগ প্রাপ্তির পর থেকেই কর্মচারী/শ্রমিকগণ এই ছুটি ভোগ করতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বার্ষিক ছুটি বা অর্জিত ছুটির ন্যায় নৈমিত্তিক ছুটি বছর শেষে শ্রমিকের হিসাবে জমা থাকবে না। বছর

শেষে অভোগকৃত ছুটি (যদি থাকে) আপনা-আপনি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

২. পীড়া/অসুস্থতাজনিত ছুটিঃ (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধিত ২০১৩, ধারা ১১৬ অনুযায়ী) প্রত্যেক কর্মচারী, শ্রমিকগণ বছরে ১৪ দিন অসুস্থতা জনিত ছুটি ভোগ করতে পারবেন নিম্নলিখিত শর্তের ভিত্তিতে-

ক. প্রত্যেক কর্মচারী/শ্রমিকগণ বছরে ১৪ দিন পূর্ণ বেতনসহ অসুস্থতাজনিত ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

খ. উক্ত ছুটি জমা রেখে পরবর্তী বছরে উত্তলন করা যাবে না।

গ. অসুস্থতাজনিত ছুটি ভোগ করতে হলে যথোপযুক্ত ডাক্তারের সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

৩. মাতৃত্বকালীন ছুটিঃ (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধিত ২০১৩, ধারা ৪৬,৪৭ এবং বিধি ৩৮ অনুযায়ী) কোম্পানী মহিলা কর্মীদের জন্য নিম্নলিখিত শর্তানুযায়ী মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করে থাকে।

ক. এই ছুটি পেতে হলে একজন মহিলা কর্মীকে ন্যনতম ৬ মাস একটানা এই কোম্পানীতে কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে।

খ. সন্তান প্রসবের ৮ সপ্তাহ পূর্বে এবং প্রসবের ৮ সপ্তাহ পরে মোট ১৬ সপ্তাহ এই ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

গ. কোন মহিলার দুই অথবা ততোধিক সন্তান জীবিত থাকিলে সে মহিলা এই সুবিধা আর পাইবেন না।

ঘ. সন্তান প্রসবের ৮ সপ্তাহ পূর্বে ডাক্তারি সার্টিফিকেটসহ ছুটির আবেদন পত্র পেশ করবে এবং সন্তান প্রসবের পর ডাক্তরের সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

ঙ. প্রসূতি কল্যাণ ভাতা "প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদান নীতি অনুযায়ী" প্রদান করা হবে।

৪. সাপ্তাহিক ছুটি ঃ (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধিত ২০১৩, ধারা ১০৩ অনুযায়ী) কোন শ্রমিককে শুক্রবার কাজ করতে দেয়া হবে না, যদিনা-

ক. উক্ত শুক্রবার এর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী ০৩ (তিন) দিনের কোন ০১(এক) দিন তিনি ছুটি ভোগ করে থাকেন বা ছুটি ভোগ করবেন।

খ. কারখানর মালিক উক্ত শুক্রবারের আগে অথবা বিকল্প ছুটির দিনের আগে যেটি আগে হয়।

গ. সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে শুক্রবার কাজ করানোর প্রয়োজনীয়তা এবং এর পরিবর্তে কোন দিন তাকে ছুটি দেয়া হচ্ছে তা উল্লেখপূর্বক পূর্বাহ্নে নোটিশ প্রদান করা হয়।

ঘ. উপরোক্ত মতে, একটি নোটিশ টানানো থাকে যে, ছুটির দিন এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় না যাতে এক জন শ্রমিককে পুরো একদিনের ছুটি ভোগ ছাড়াই একটানা ১০ দিনের বেশী কাজ করতে হয়।

৫. উৎসব ছুটিঃ (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধিত ২০১৩, ধারা ১১৮ অনুযায়ী)

ক. প্রত্যেক শ্রমিককে বছরে অন্ততঃ ১১ (এগার) দিন (কোম্পানীর নীতিমালার উপর নির্ভরশীল) উৎসব উপলক্ষ্যে মজুরীসহ অবকাশ মঞ্জুর করতে হবে। অনুরূপ উৎসব দিন ও তারিখ কারখানা মালিক নির্ধারিতব্য পদ্ধতি অনুসারে নির্দিষ্ট করবেন।

খ. শ্রমিককে কোন উৎসব ছুটির দিনে কাজ করানো যেতে পারে কিন্তু এর বিনিময়ে ১০৩ ধারা অনুসারে তাকে পূর্ণ মজুরীসহ ক্ষতিপূরণমূলক ০২ (দুই) দিনের এবং অতিরিক্ত একটি বিকল্প ছুটির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. মজুরীসহ বার্ষিক ছুটি (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধিত ২০১৩, ধারা ১১৭ এবং বিধি ১০৭ অনুযায়ী)

যে সকল শ্রমিক অত্র কারখানায় বা একই মালিকানাধীন বদলীযোগ্য পদে অব্যাহতভাবে ০১ (এক) বছর চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ করেছে তারা পরবর্তী ১২ (বার) মাসের মধ্যে নিন্মোক্ত হারে মজুরীসহ বার্ষিক ছুটি ভোগ করতে পারবেঃ

- সকল কর্মী যাদের চাকুরীর বয়স ১ বৎসর পূর্ণ হয়েছে তারা পরবর্তী বছরে পূর্ববর্তী বছরের প্রতি ১৮ দিনের জন্য ১ দিন অর্জিত ছুটি ভোগ করার অধিকারী হবেন।
- এই ছুটি সম্পূর্ণ বা আংশিক ভোগ না করে থাকলে পরবর্তী বছরে তার পাওনা ছুটির সাথে তা যোগ করা হবে।
- একজন প্রাপ্ত বয়স্ক কর্মচারী, শ্রমিকদের অর্জিত ছুটির পরিমাণ ৪০ দিন হলে সে আর এই ছুটি জমা করতে পারবেন না।
- মঞ্জুরকৃত কোন ছুটির সময়ের মধ্যে যদি অন্য কোন ছুটি পড়ে তাহা হইলে উক্ত ছুটিও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।
- প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক হলে পূর্ববর্তী ১২ (বার) মাসের মধ্যে প্রতি ১৮ কর্ম দিবসের জন্য ১ দিন।
- শিশু বা কিশোর শ্রমিক হলে পূর্ববর্তী ১২ (বার) মাসের মধ্যে প্রতি ১৫ কর্ম দিবসের জন্য ১ দিন।

অনুরূপ মেয়াদের মধ্যে যে অবকাশ বা ছুটি থাকবে তা আলোচ্য ছুটির অন্তর্ভূক্ত হবে। তবে যদি কোন শ্রমিক এ ছুটি আংশিক বা সম্পর্ণ ভোগ না করে তবে তাহা পরবর্তী বৎসরের পাওনা ছুটির সঙ্গে যোগ হবে। শর্ত হচ্ছে যে, প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের ক্ষেত্রে ৪০ (চল্লিশ) দিন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিকের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) দিন পর্যন্ত অর্জিত ছুটি জমা থাকবে। উল্লেখিত পরিমাণ ছুটির পর যদি সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের আরও ছুটি পাওনা থাকে তা হলে সেটা তার মওজুদ ছুটির সাথে যুক্ত হবে না।

এ ধরনের ছুটি মঞ্জুরীর বিবরণঃ সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ছুটি শুরু কমপক্ষে ০২ (দুই) দিন পূর্বে ছুটির আবেদন পত্র জমা করবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করে তাকে অবহিত করবে। যদি কোন বিশেষ কারণে তার আবেদন মঞ্জুর করা না যায়, সে ক্ষেত্রে বিষয়টি পূর্বাহ্নে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে অবহিত করা হবে। নিম্নবর্ণিত কোন কারণে চাকুরীতে ছেদ পড়লেও এ ধারার উদ্দেশ্যে একজন শ্রমিক অব্যাহত চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ করেছে বলে গণ্য হবে।

- কোন অবকাশজনিত কারণে অনুপস্থিত থাকলে।
- মজুরীসহ ছুটিতে থাকলে;
- অসুস্থতা বা দুর্ঘটনার জন্য মজুরীসহ বা মজুরী ছাড়া ছুটিতে থাকলে;
- অনধিক ১৬ সপ্তাহ মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকলে।

৭. স্বল্পকালীন ছুটিঃ

কোন শ্রমিক কারখানায় কর্মরত অবস্থায় ব্যক্তিগত কোন বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যাবার প্রয়োজন হলে তাকে স্বল্পকালীন ছুটি মঞ্জুর করে থাকেন। এ ধরণের ছুটির জন্য সংশ্লিষ্ট শ্রমিক তার ম্যানেজার/ প্রোডাকশন অফিসারকে প্রয়োজনীয়তার কথা জানাবার পর ম্যানেজার/প্রোডাকশন অফিসার শ্রমিকের বাহিরে যাবার অনুমতিপত্র

তৈরী ও তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষরের ব্যবস্থা করে। এ জন্য সর্বোচ্চ ৫-৭ মিনিট সময়ের বেশি যাতে ব্যয় না হয় সেজন্য ম্যানেজার/প্রোডাকশন অফিসারকে অবহিত করা আছে। কোন শ্রমিককে স্বল্পকালীন ছুটি প্রদানের জন্য তার বেতন/জমাকৃত ছুটি বা অন্য কোন ছুটি কর্তন করা হয় না।

৮. ক্ষতিপূরণমুলক সাপ্তাহিক ছুটি (বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধিত ২০১৩, ধারা ১০৪ অনুযায়ী)

সাধারণ কর্ম সময় হচ্ছে দৈনিক ৮ঘন্টা। প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন কাজ করার পর প্রতিটি শ্রমিক একদিন সাপ্তাহিক ছুটি বা বিশ্রাম পায়। কোন ছুটি বা বিশ্রামের দিনে বিশেষ কারণে যদি কোন শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো হয় তবে তাকে বিষয়টি পূর্বেই অবহিত করা হয়। ছুটি বা বিশ্রামের দিন কাজ করার জন্য তাকে ঐ কাজের পরবর্তী তিন দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করা হয়ে থাকে।

▪ ধারা ১০৩ মোতাবেক কোন শ্রমিককে তাহার প্রাপ্য সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান সম্ভব না হইলে উক্ত শ্রমিককে তাহার উক্তরূপ ছুটি প্রাপ্য হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

▪ সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান না করিয়া কোন শ্রমিককে একাধারে ১০(দশ) দিনের অধিক কাজ করানো যাইবে না।

▪ ধারা ১০৪ এর বিধান অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত শ্রমিকগণের প্রাপ্য কোন ক্ষতিপূরণমূলক সাপ্তাহিক ছুটি প্রাপ্য হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

▪ শ্রমিকের ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি অনুমোদনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক উক্তরূপ ছুটির একটি বিজ্ঞপ্তি ধারা ১০৪ মোতাবেক নোটিশ বোর্ডে লটকাইয়া রাখিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ছুটির বিজ্ঞপ্তিতে কোন পরিবর্তন আনয়নের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট ছুটির তারিখের অন্তত ৩ (তিন) দিন পূর্বে উহা করিতে হইবে।

ছুটি বা অবকাশকালীন মজুরীঃ

শ্রমিকেরা যখন ছুটি বা অবকাশ যাপন করে তখন তাদেরকে নিম্ন বর্ণিত নিয়মে মজুরী প্রদান করা হয়ে থাকেঃ

• পূর্ণ মজুরীসহ ছুটির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মাসে গড়ে সে প্রতিদিন কাজের জন্য যে বেতন বা মজুরী পেয়েছে তার সমপরিমাণ মজুরী তাকে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে ওভারটাইম ভাতা বা উৎসব ভাতা পেয়ে থাকলে তা হিসাবে গণ্য হয় না।

• অর্ধ বেতনে ছুটির ক্ষেত্রে প্রতিদিন কাজের জন্য অনুচ্ছেদ ‘ক’ এ উল্লেখিত বেতনের দৈনিক হিসাবে অর্ধেক মজুরী পায়।

• শ্রমিকেরা আবেদন করলে ছুটিতে গমণের সময় তাদেরকে অগ্রিম মজুরী দেওয়ার ও বিধান আছে। প্রয়োজন অনুসারে শ্রমিকেরা অগ্রিম মজুরী নিয়ে থাকে।

ছুটি বর্ধিতকরণঃ

• ছুটিতে যাওয়ার পর কর্মচারী/শ্রমিকগণ যদি ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে চায় এবং যদি বর্ধিত মেয়াদের জন্য ছুটি পাওনা থাকে তবে তাকে ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার যথেষ্ট আগে কর্তৃপক্ষের নিকট ছুটির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

• ছুটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও যদি পরবর্তী ১০ দিনের মধ্যে কর্মচারী/শ্রমিকগণ কাজে যোগদান না করে এবং যথা সময়ে কাজে যোগদান না করার কারণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্টিমূলক জবাব দিতে না পারলে চাকুরীর শর্ত হারাবে।

• বিনা অনুমতিতে ১০ দিন অনুপস্থিত থাকার পর কোন কর্মী যদি কর্তৃপক্ষকে সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে, তবে তাকে অনুমোদিত ছুটির দিন ব্যতীত বাকি দিনগুলো বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা হবে।

ছুটি নেয়ার পদ্ধতিঃ

১. ছুটি প্রার্থী ব্যক্তিকে কোম্পানীর নির্ধারিত ফরমে ছুটির জন্য আবেদন করতে হবে।

২. ছুটির আবেদনপত্র পূরণ করে প্রথমে যার যার বিভাগের বিভাগীয় প্রধানের কাছে জমা দিতে হবে।

৩. বিভাগীয় প্রধান ছুটির সুপারিশ করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রশাসন বিভাগে পাঠাবেন।

৪. প্রশাসন বিভাগ চূড়ান্ত অনুমোদনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ছুটি অনুমোদনকারীঃ

১. ব্যবস্থাপনা পরিচালক সকল বিভাগের বিভাগীয় প্রধানদের ছুটি অনুমোদন করবেন।

২. প্রশাসন বিভাগের প্রধান বিভাগীয় প্রধানদের ছাড়া অন্যান্য সকলের ছুটি অনুমোদন করবেন।

৩. বিভাগীয় প্রধানগণ স্ব-স্ব বিভাগের ছুটি অনুমোদন করবেন।

উপসংহারঃ একটি নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়নই হচ্ছে তার সাফল্য। যথাযথ ভাবে তার সকল নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করলে শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন হবে।

লেখক: কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশে কর্ম পরিবেশ এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহনের প্রভাব

ফাহিম ফয়সাল

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় বাংলাদেশে গত ছয় বছরে মারা গিয়েছে ৪ হাজার ৭৯৫ শ্রমিক। ২০২০ সালে নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গিয়েছেন ৩১৬ এবং এর আগের বছর ১ হাজার ২৯২ শ্রমিক (প্রথম আলো ১ মে ২০২১)। গত ১৭ এপ্রিল চট্টগ্রামের বাঁশখালিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ৭ জন আন্দোলনরত শ্রমিক। ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসে হাজারের বেশি শ্রমিক নিহতের কথা নিশ্চয় মনে আছে। এই পরিসংখ্যানগুলো কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা প্রমাণ করে। তদুপরি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে ন্যূনতম মজুরি সবচেয়ে কম। বাংলাদেশে শ্রমিকরা ৯০ ভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন (প্রথম আলো, ১ মে ২০২১)। অর্থাৎ দিন এনে দিন খাওয়া। আজ কাজ আছে তো কাল নেই। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানের সাথে তাদের সংযোগ কম। ফলে কর্মক্ষেত্রে কাজের দক্ষতায় পিছিয়ে আছে এদেশের শ্রমিকেরা। শ্রমিকের পারিবারিক জীবনে এমন কর্মপরিবেশের প্রভাব চিন্তা করুন। উপরন্তু করোনা ও লকডাউন পরিস্থিতির কারণে বহু শ্রমিক কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়েছে। করোনাকালে ১০ হাজার পোশাক শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন, বেতন কমে গেছে ৩৫ ভাগ শ্রমিকের (প্রথম আলো, ২৯ মার্চ ২০২১)। আয় না থাকলে শ্রমিকের সংসার চলবে কীভাবে? এদিকে নারীরা প্রতিনিয়ত কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে। ১ কোটি ৬২ লাখ নারী এখন কর্মে যুক্ত (ডয়চে ভেলে, ৫ মার্চ ২০১৯)। পোশাক শিল্পে কর্মরত আছে প্রায় ২৫ লাখ নারী। বিদেশে কর্মরত আছে ৮০ হাজার প্রবাসী নারী। দেশে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতার ৯০ শতাংশ নারী। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর এই অংশগ্রহণ বেশিরভাগই শ্রমিক হিসেবে। পারিবারিক জীবনে এর প্রভাব ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক? এগুলো বিশ্লেষণ করার দরকার আছে।

বাংলাদেশে নারী-পুরুষে মজুরি বৈষম্য রয়েছে। নারীর শ্রমকে স্বল্প গণ্য করা হয়। ফলে বিপুল সংখ্যক নারীর কর্মে যুক্ত হওয়ার কারণে পুরুষ প্রতিযোগিতায় পড়ে যাচ্ছে। একজন নারীর রোজগার সংসারে যুক্ত হলে পরিবার উপকৃত হয়। কিন্তু পুরুষদের জন্য কাজ কমে যাওয়া সামষ্টিকভাবে নেতিবাচক। শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। স্বাধীনতার সময় প্রাথমিকের মোট শিক্ষার্থীর ২৮ ভাগ ছিল নারী। এখন সেটা ৫১ শতাংশ (প্রথম আলো, ২৪ জানুয়ারি ২০২১)। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকেও ছেলে-মেয়ের অংশগ্রহণ প্রায় সমান সমান। তবে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এখনো কিছুটা কম, ৩৮ শতাংশ। শিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে বলে কি কর্মেও বেড়েছে? তা অবশ্য বেড়েছে। কিন্তু আনুপাতিক হারে নারীর অংশগ্রহণ এখনো শ্রমিক শ্রেণিতে বেশি। কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ দেখানো হচ্ছে ১ কোটি ১১ লাখ (প্রথম আলো ২৩ এপ্রিল ২০২১)। আবহমানকাল থেকে নারীরা গৃহস্তের কৃষি কাজে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এখন এটা ব্যবসা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। পুরুষেরা পড়ালেখা ও কর্মের খোঁজে শহরমুখী। ফলে গ্রামে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে। বস্তুত পরিবার নিয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নারী ঘরের কাজে সময় দিবে আর পুরুষ বাইরে রোজগারে ব্যস্ত থাকবে। দুজনের কর্মক্ষেত্র দুদিকে হলেও একে অপরের সহযোগী হবে। একারণে ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অনেক। কারণ ঘর সামলানো সহজ কাজ নয়। পুরুষের কাজ না বুঝলে তাকে সহযোগিতা ও পরামর্শ দেয়া নারীর পক্ষে কঠিন। এছাড়া রয়েছে সন্তান লালনপালন। উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা পরিবারের সাথেই অবস্থান করে। তাই মা, বোন, খালা, ফুফু শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিলেও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে। তবে নিষিদ্ধ করেনি। কারণ এমন অনেক সেক্টর রয়েছে যেখানে নারীর প্রয়োজন হয়। যেমন মেয়েদের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য নারী শিক্ষক ও নারী ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু গার্মেন্টসে নারীর অংশগ্রহণে সে ধরণের প্রয়োজনীয়তা নেই। মূলত কম মূল্যে নারীর শ্রম নেয়া হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে। নাম দেয়া হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। কিন্তু এতে ঘর অরক্ষিত থেকে যাচ্ছে। অথচ ঘর সুরক্ষিত হলে পরিবার স্বচ্ছলতার দিকে এগিয়ে যায়। কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রয়োজনীয়তা আরো অনেক কারণে দরকার হতে পারে। যেমন বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারী

ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিলেও কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করে। তবে নিষিদ্ধ করেনি। কারণ এমন অনেক সেক্টর রয়েছে যেখানে নারীর প্রয়োজন হয়। যেমন মেয়েদের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য নারী শিক্ষক ও নারী ডাক্তারের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু গার্মেন্টসে নারীর অংশগ্রহণে সে ধরণের প্রয়োজনীয়তা নেই। মূলত কম মূল্যে নারীর শ্রম নেয়া হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরে। নাম দেয়া হয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন। কিন্তু এতে ঘর অরক্ষিত থেকে যাচ্ছে। অথচ ঘর সুরক্ষিত হলে পরিবার স্বচ্ছলতার দিকে এগিয়ে যায়।

কিংবা অভিভাবকহীন নারীদের ক্ষেত্রে কর্মের সুযোগ থাকা ক্ষেত্র বিশেষে জরুরি হয়ে পড়ে। একারণে কর্মে যুক্ত হওয়াকে ইসলাম নিষিদ্ধ করে না। তবে এসব ক্ষেত্রে দায়িত্বটা পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সেটাও ইসলামের শিক্ষা। নারীকে যাতে কর্মক্ষেত্রে যুক্ত না হতে হয় সেজন্য অভিভাবকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পুরুষের কাঁধে। বিয়ের আগে বাবা, ভাই ও অন্যান্য মাহরাম পুরুষের দায়িত্ব। বিয়ের পরের দায়িত্ব স্বামীর। স্বামী না থাকলে আবার সেটা বাবা, ভাই, মামা-চাচাদের দায়িত্ব। তদুপরি তাদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য রয়েছে মোহরানা এবং উত্তরাধীকার হিসেবে পাওনা সম্পত্তি। সুতরাং শ্রমজীবীতে নারীর অংশগ্রহণ ইসলামী সংস্কৃতির অংশ নয়। নারী অধিকারের নামে যারা নারীকে বাইরে নিযুক্ত করছেন তারা আসলে পরিবারের গুরুত্ব বুঝেন না। পারিবারিক বন্ধন ভেঙে গেলে তাদের কিছু যায় আসে না। পরকীয়া ও লিভটুগেদার বেড়ে গেলে তারা বরং খুশি হন। লেখার প্রথম দিকে যে পরিসংখ্যান উল্লেখ করা হয়েছে তাতে এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সুবিধাজনক নয়। নারীর জন্য সেটা আরো অস্বস্তিকর। যৌন হয়রানি এবং হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া খুবই সাধারণ বিষয়। ইসলাম ঘরের কাজে নারীকে যেধরণের সহযোগিতার কথা বলে বাংলাদেশের পুরুষরা তাতে বেশ পিছিয়ে আছে। কর্মজীবী নারীদের পেশাগত কাজের চাপের পাশাপাশি ঘরের ঝামেলাও সামলাতে হচ্ছে। ফলে পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শান্তি অধরা থেকে যাচ্ছে। তবে বাংলাদেশে শ্রমজীবীতে নারীর যুক্ত হওয়া এখনো প্রয়োজনের খাতিরে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটা এখনো বিলাসিতার বিষয় নয়। এত কম মজুরিতে এবং পুরুষদের তুলনায় কম অর্থ প্রাপ্তির পরও শ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ সেটাই প্রমাণ করে। একারণে মুখে শুধু বললে হবে না যে নারীর কাজ ঘরে। একই সাথে নারীর প্রয়োজনের বিষয়টা গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। নারীর এই প্রয়োজনের বিষয়টা কথিত নারীবাদিরা নিয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায়। শ্রমিকের পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামপন্থীদের তাই নজর দিতে হবে পুরুষের কর্মসংস্থানে। পাশাপাশি সন্তান লালন পালনের মাধ্যমে নারীকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাতে হবে। সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সন্তান ও স্বামীদের পেছনে নারীদের ভূমিকা বুঝানো দরকার। পুরুষের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে কী করা যায়? কর্মসংস্থান সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। বিভিন্ন সরকারি-বে-সরকারি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে তাদেরকে শামিল করতে হবে। ব্যবসা শুরুর জন্য ছোট পুঁজির ব্যবস্থা করতে হবে। যাকাত কার্যক্রমের মাধ্যমে ভিটেমাটিতেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এটা করতে পারলে শহরমুখী নারী পুরুষের ভিড় কমে যাবে। স্ত্রী সন্তানদের গ্রামে রেখে শহরে আসতে হলে পারিবারিক শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে। আর কৃষি নির্ভর বাংলাদেশে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলে গ্রামে থেকেও ভালোভাবে কর্মসংস্থান সম্ভব। ঘরে থেকে নারীদেরও পশুপালন ও কৃষিতে যুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। হযরত রাফে ইবনে খাদীজা রাদিয়ালাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি? জবাবে তিনি বলেন, ব্যক্তির নিজস্ব শ্রমলব্ধ উপার্জন ও সততার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয়। (ইমাম আহমদ, মুসনাদ)

ইসলামী অর্থ ব্যাবস্থায় ধনীদের কাছ থেকে গরীবের নিকট সম্পদ পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে। যেমন যাকাত, ফেতরা, ফিদিয়া, দান

“

বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ সুবিধাজনক নয়। নারীর জন্য সেটা আরো অস্বস্তিকর। যৌন হয়রানি এবং হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া খুবই সাধারণ বিষয়। ইসলাম ঘরের কাজে নারীকে যে ধরণের সহযোগিতার কথা বলে বাংলাদেশের পুরুষরা তাতে বেশ পিছিয়ে আছে। কর্মজীবী নারীদের পেশাগত কাজের চাপের পাশাপাশি ঘরের ঝামেলাও সামলাতে হচ্ছে। ফলে পারিবারিক শৃঙ্খলা ও শান্তি অধরা থেকে যাচ্ছে। তবে বাংলাদেশে শ্রমজীবীতে নারীর যুক্ত হওয়া এখনো প্রয়োজনের খাতিরে। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটা এখনো বিলাসিতার বিষয় নয়। এত কম মজুরিতে এবং পুরুষদের তুলনায় কম অর্থ প্রাপ্তির পরও শ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ সেটাই প্রমাণ করে। একারণে মুখে শুধু বললে হবে না যে নারীর কাজ ঘরে। একই সাথে নারীর প্রয়োজনের বিষয়টা গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। নারীর এই প্রয়োজনের বিষয়টা কথিত নারীবাদিরা নিয়েছে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠায়। শ্রমিকের পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলামপন্থীদের তাই নজর দিতে হবে পুরুষের কর্মসংস্থানে।

”

করা ইত্যাদি। দান করাকে আল্লাহর পথে অর্থ খরচ এবং আল্লাহকে ঋণ দেয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। আল বাকারা ২৭৬, আত তাগাবুন ১৭ এবং আল আনফাল ৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহর পথে খরচ করলে কয়েক গুন বাড়িয়ে ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মহান আল্লাহ। সুরা বাকারার ২৬১ নম্বর আয়াত অনুযায়ী সেটা ৭০০ গুন। আমাদের সমাজে যাকাত গ্রহীতা ও যাকাত দাতা উভয়ই বেশি। কিন্তু যাকাত আদায় ও প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে। যাকাতের অর্থ গরীবের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যয় করা সবচেয়ে যৌক্তিক। শ্রমিক পরিবারের নারী, পুরুষ ও শিশু সবাই যাকাত থেকে উপকৃত হতে পারে। অথচ সমাজে প্রচলিত রয়েছে সুদী কারবার। যাকাতের সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ সুদ। এতে নিম্ন আয়ের মানুষের অসচ্ছলতার সুযোগে তাদের আরো নিস্পেষণ করা হয়। কর্মসংস্থানের মতো শুধু বৈষয়িক উপায় উপকরণ ঠিক করে শ্রমিক পরিবারে কল্যাণ ও বরকত বয়ে আনা সম্ভব না। আল কুরআন এ বিষয়টা বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তারপর যখন নামায শেষ হয়ে যায় তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। (সূরা জুমআ ১০)

পরের আয়াতেই আল্লাহ তায়ালা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, দ্বীন ইসলামের কাজ বাদ দিয়ে শুধু উপার্জনের জন্য ছোটা মোটেও ভালো কাজ নয়। বস্তুত আলাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। আমরা যদি মনে করি পুরুষদের ভালো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করলেই শ্রমিক পরিবারে শান্তি আসবে আসলে তা নয়। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দ্বীনের পথে রুজু হওয়াকে গুরুত্ব দিতে হবে। হালাল হারামের সীমারেখা বুঝাতে হবে। বস্তুত সব ধরণের পেশার ক্ষেত্রেই হালাল হারামের প্রসঙ্গ রয়েছে। ইসলাম সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে। দাওয়াতী কাজ, দ্বীনের প্রতি রুজু হওয়া, ইকামতে দ্বীনের কাজ এবং মানবসেবার মাধ্যমে মানুষের সমস্যার সমাধান ইত্যাদি কাজে সম্পৃক্ত হতে হবে। বাংলাদেশে শ্রমিকের কর্মপরিবেশ উন্নত করা, নারী-পুরুষের যৌক্তিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের জীবন মানের উন্নতি করা সবই ইকামতে দ্বীনের কাজের অংশ। এ জন্য ইসলাম তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির কথা বলে। তাকওয়া এমন এক গুণ যার মাধ্যমে দুনিয়ায় সমাজ পরিবর্তন সম্ভব হয়। তাকওয়া ব্যক্তির মধ্যে তাড়না সৃষ্টি করে। ইকামতে দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দেয়ার দায়িত্বানুভূতি বৃদ্ধি করে। এর ফলে ব্যক্তি বৈষয়িক যোগ্যতার অধিকারী হয়ে ওঠে। কারণ তাকে ইকামতে দ্বীনের কাজের জন্য সম্ভাব্য সবকিছু অর্জন করতে হয়। শ্রমিকের কর্মপরিবেশ উন্নতি করা এবং শ্রমিক পরিবারে নারীর ইতিবাচক ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করতে হবে।

লেখক: সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

চা - শ্রমিকের জীবন-যাপন

আব্দুল্লাহ আল মামুন

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হলো চা। আধুনিক নগর জীবনে কত ব্যস্ত মানুষ, কত বিচিত্র তার প্রকাশ! প্রতিটা রাতের শেষে সূর্য ওঠার মধ্য দিয়ে শুরু হয় আরেকটি কর্মমুখর দিন। শুরু হয় নিরন্তর ছুটে চলা। তারই মাঝে একটু অবসর। একটু অবকাশ নেওয়া। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে-হাসি-কান্না, আনন্দ-বিষাদ-সবখানেই এক কাপ গাঢ় লিকারের চা নিয়ে আসে গভীর তৃপ্তি। শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মতো সাজানো সবুজের এই রাজ্য দারুণভাবে টানে আমাদের। কর্মব্যস্ত নাগরিক জীবনের সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয় প্রকৃতির নির্মল পরশ। অথচ এত আলোর নিচেই যে আছে এক অন্ধকার জগৎ, সেটা আমরা ক'জন জানি? শৈল্পিক সৌন্দর্য বিমোহিত ক'জন খোঁজ রাখি কত কান্না, কত আর্তনাদ আছে ভেতরে?

এদেশে চা শিল্প বিকাশের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। খ্রীস্টপূর্ব সময় থেকে চীনদেশে মূলত চায়ের প্রচলন। ৮০০ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে প্রচলন শুরু হলেও এদেশে চায়ের প্রচলন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরেই। ১৮৩৪ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংকের গঠিত কমিটি বিস্তর গবেষণার পর ঘোষণা দেয় যে, আসামের চা চীনা চায়ের চেয়ে অনেক উন্নতমানের। এ ঘটনা চা শিল্পের জন্য নবদিগন্ত উন্মোচন করে। ১৮৫৪ সালে সিলেটের মালনীছড়া চা বাগানের মাধ্যমে এ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চায়ের চাষ শুরু হয়। কিন্তু সমস্যা হলো বাগান করতে প্রচুর শ্রমিক প্রয়োজন হয়। এত শ্রমিক আসবে কোথা থেকে? এর সমাধান খুঁজতে গিয়ে তৈরি হয় মানবসভ্যতার এক নির্মম ইতিহাস।

আজীবন কাজের শর্তে চুক্তিবদ্ধ করে বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, উত্তর প্রদেশ, বাকুড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে গরীব চাষীকে চা শ্রমিক হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। ব্রিটিশরা তাদের সামনে প্রচার করেছিল উন্নত জীবনের নানা গল্প, বলেছিল বাগানের গাছ নাড়া দিলেও নাকি পয়সা পড়বে। শুধুই ছলনা দিয়ে নয়, অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভয়-ভীতি দেখিয়েও বাধ্য করা হতো তাদের কথা শুনতে। অসহায় মানুষগুলো ধূর্ত ইংরেজদের কথায় বিশ্বাস করে নিজেদের পরিচিত আজন্ম পরিবেশ ছেড়ে চলে এসেছিল একটু ভালো জীবনের আশায়। দেড় শতাধিক বছর ধরে কি সীমাহীন আত্মত্যাগ আর কি অপূর্ব মমতায় এই শিল্পীরা গড়ে তুলেছে আজকের এই শিল্প তা বাইরে থেকে কল্পনা করা কঠিন। তখনকার গহীন অরণ্য আর পাহাড়ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে চা শিল্পে রূপ দিতে গিয়ে সেদিন মেনে নিতে হয়েছিল প্রায় দাসোচিত জীবন। তারপরও বুকের নিভৃত কোনে জেগে ছিল একটু ভালো থাকার স্বপ্ন।

বর্তমানে চা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরি ফসল। বিশ্বের প্রায় ২৫ টি দেশে চা রপ্তানি হয় বাংলাদেশ থেকে। প্রায় ১৫ লক্ষাধিক জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রমে সচল হয় দেশের অর্থনীতি। প্রতিদিন তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে তৈরি করা সম্পদ নিজেদের জীবনে কাজে না লাগলেও তাতে প্রতিদিন ফুলে ফেঁপে ওঠে মালিকের ধনভান্ডার।

আজ যখন ১ কেজি চালের দাম ৫০-৬০ টাকা, পেঁয়াজের দাম কিছুদিন পরপর ১০০ ছাড়ায়, তখন চা শ্রমিকের মজুরি মাত্র ১০২ টাকা। কিছুদিন আগেও যা ছিল ৮৫ টাকা। আইএলও- প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ৫৫% চা শ্রমিকের মাসিক আয় ১৫০১ টাকা; ৩৩% এর ১৫০০ টাকা এবং মাত্র ২ শতাংশ চা শ্রমিকের আয় ৩ হাজার টাকা।

গত দশ বছরে চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি বেড়েছে ৭০ টাকা। প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই আমরা দেখি উন্নয়নের জোয়ারে দেশ ভাসছে। দেশ এই সুইজারল্যান্ড হলো বলে! সত্যিই এ এক উন্নয়ন বটে! এই মজুরি দিয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসাতো দূরের থাক, কোনোরকমে বেঁচে থাকাই যায় না। যুগ যুগ ধরে এ অঞ্চলে চা শ্রমিকরা বসবাস করলেও ভূমির অধিকার দূরের কথা, ছোট আলো-বাতাসহীন ঘরে কোনোরকমে বসবাস করে তারা। ব্রিটিশ গেল, পাকিস্তানও বিদায় নিল। বারবার আশায় বুক বাঁধলেন চা শ্রমিকরা। কিন্তু হতাশ হতে হলো বারে বারে। স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রান্ত হলো কিন্তু পূর্বপুরুষের ভিটায় চা শ্রমিকদের কোনো আইনি অধীকার নেই। মালিক চাইলেই যে কোনো শ্রমিককে বাগান থেকে তুলে দিতে পারে। আজ চা বাগানে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা পর্যন্ত নেই। অনিশ্চিত তার ভবিষ্যৎ। চা শ্রমিকরা যে মজুরি পান এতে তাদের পুষ্টির নূন্যতম চাহিদাও পূরণ হয় না। কর্মক্ষেত্রে বিশ্রাম, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যকর সেনিটেশনের অভাবে শ্রমিকরা আছেন চূড়ান্ত স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। ১৯৬৬ সালের 'ট্রি প্ল্যান্টেশন লেবার অর্ডিন্যান্স' ও ১৯৭৭ সালের 'প্ল্যান্টেশন

রুল্‌স' অনুযায়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাগান কর্তৃপক্ষের। কিন্তু দেশের ১৬৪টি বাগানের মধ্যে ১ জন করে এমবিবিএস ডাক্তার আছে মাত্র ৬টিতে। আইএলও বলছে, ৬৩ শতাংশ শ্রমিক স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। শ্রমিকদের মধ্যে ৭২ শতাংশ পেটের ব্যাথা, ৮৪ শতাংশ মাথা ব্যাথা ও ৭৪ শতাংশ মাংসপেশির ব্যাথায় ভুগছেন। শ্রমিকদের বড় অংশই ভোগেন রক্তশূন্যতায়। চা শ্রমিকদের ৬৪ শতাংশই নারী শ্রমিক। তাদের অবস্থা আরো করুণ। প্রায় ৯১ ভাগ নারী শ্রমিক তাদের সর্দারদের দ্বারা নিগ্রহের শিকার হন।

আধুনিক গনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার অধিকার আছে সবার। সংবিধানেও এর স্বীকৃতি আছে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আজও চা শ্রমিকরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। সারা দেশের ১৬৬/১৬৭টি বাগানের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে মাত্র ৬টিতে (মতান্তরে ১০/১৩ টিতে)। মাধ্যমিক স্কুল আছে মাত্র ৩ টিতে। শিক্ষার অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা এক অর্থে তাকে সমাজবিচ্যুত করে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়া। তার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে অধীনতায় ঠেলে দেয়া। বছরের পর বছর অবহেলা ও অপমানের বোঝা বৃহৎ এ জনগোষ্ঠীকে সভ্যতার আলো থেকেই বঞ্চিত করেনি, নিজেকে মানুষ ভাবার অধিকার থেকেও যেন বঞ্চিত করেছে। তাদের এই পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ শিক্ষার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা। গত দেড়শ' বছরে অনেক কিছু পাল্টালেও, চা শ্রমিকদের এ দাসত্বের জীবন পাল্টায়নি। তারা আজো অধিকার বঞ্চিত। আজো সমাজ- সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন তারা। চা শ্রমিকদের এই দীর্ঘ পথচলা মূলত বঞ্চনা আর অপমানের ইতিহাস। ক্রমে তাদের নিঃশেষ হবার ইতিহাস। সভ্যতার এ নির্মমতার অধ্যায় আর কতকাল চলবে তার উত্তর মেলা ভার। তাদের সকল স্বপ্ন কেড়ে নিয়ে তৈরি হয় মালিকের মুনাফার পাহাড়। আর একেই ঘোষণা দেওয়া হয় উন্নয়ন বলে।

শোষণের বহু পন্থার শিকার চা শ্রমিকরা। যেমন মজুরি নির্ধারণের প্রচলিত পদ্ধতির কোনো কিছুই অনুসরণ করা হয় না। এ সেক্টরের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, যা বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত মজুর লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যায়। যেমন ২০০৭ সালে মজুরি ছিল ৩২ টাকা ৫০ পয়সা, ২০০৯ সালে মজুরি ছিল ৪৮ টাকা, ২০১৩ সালে মজুরি ছিল ৬৯ টাকা, ২০১৫-১৬ সালে মজুরি ছিল ৮৫ টাকা, ২০১৭-১৮ সালে মজুরি ১০২ টাকা। এই মজুরির মেয়াদকাল শেষ হওয়ার ২২ মাস পর গত ১৫ অক্টোবর বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও বাংলাদেশী চা-সংসদের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী চা শ্রমিকদের মজুরি এ ক্লাস বাগানে দৈনিক ১২০ টাকা, বি ও সি ক্লাস বাগানে যথাক্রমে ১১৮ ও ১১৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ন্যাশনাল টি কোম্পানি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ছোট-বড় বাগানসহ সব মিলিয়ে বাংলাদেশে চা বাগান রয়েছে মোট ১৬২টি। চা-শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, উৎপাদনে ভিন্ন কৌশল, নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও শ্রমিকদের আধুনিক প্রশিক্ষণের কারণে প্রতিবছরই চায়ের উৎপাদন বাড়ছে। গত বছর চা শিল্প ১৬৫ বছরের ইতিহাসে অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে উৎপাদনে নতুন রেকর্ড করেছে। বাংলাদেশ চা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে উৎপাদিত

> **স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিক্রান্ত হলো কিন্তু পূর্বপুরুষের ভিটায় চা শ্রমিকদের কোনো আইনি অধীকার নেই। মালিক চাইলেই যে কোনো শ্রমিককে বাগান থেকে তুলে দিতে পারে। আজ চা বাগানে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা পর্যন্ত নেই। অনিশ্চিত তার ভবিষ্যৎ। চা শ্রমিকরা যে মজুরি পান এতে তাদের পুষ্টির নূন্যতম চাহিদাও পূরণ হয় না। কর্মক্ষেত্রে বিশ্রাম, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যকর সেনিটেশনের অভাবে শ্রমিকরা আছেন চূড়ান্ত স্বাস্থ্যঝুঁকিতে।**

এ চায়ের পরিমাণ ৯৫ মিলিয়ন বা ৯ কোটি ৫০ লাখ কেজি। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ চা বোর্ড এর চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০ মিলিয়ন বা ৮ কোটি কেজি চা পাতা। উৎপাদনের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ১৫ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৫০ লাখ কেজি বেশি চা-পাতা উৎপাদন হয়েছে ।

চা সংশ্লিষ্টরা চায়ের বাম্পার ফলনের কারণ হিসেবে চা-বাগানগুলোতে চা শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত, অনুকূল আবহাওয়া, পোকামাকড়ের আক্রমণ কম থাকা, খরার কবলে না পড়াসহ সর্বোপরী বাংলাদেশ চা বোর্ডের নজরদারিকে এবারের চা উৎপাদনে নতুন রেকর্ডের কারণ হিসেবে মনে করছেন। তবে প্রতিবছর চায়ের উৎপাদন বাড়লেও, পরিবর্তন হচ্ছে না চা শ্রমিকদের জীবনমানের।

সর্বশেষ ২০১৬ সালে চা-শ্রমিকের হাজিরা (দৈনিক বেতন) ৮৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০২ টাকা করা হয়েছিল। এরপর প্রায় ৪ বছর পেরিয়ে গেলেও আর বাড়েনি চা-শ্রমিকের বেতন। প্রতিদিন ২৪ কেজি পাতা তুললে একজন শ্রমিক পায় ১০২ টাকা। ২৪ কেজির কম পাতা তুললে আনুপাতিক হারে বেতন কাটা হয়ে থাকে। একজন চা শ্রমিক সপ্তাহে ছয়দিন কাজ করে পায় ৬১২ টাকা। সঙ্গে রেশন হিসেবে আছে সপ্তাহে মাত্র তিন কেজি আটা। তা নিয়েও রয়েছে বিস্তর অভিযোগ।

সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা থাকলেও ঔপনিবেশিক মানসিকতায় কিছু চা বাগানে তা মানা হচ্ছে না। আদালতের নির্দেশনা উপেক্ষা করে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জসহ বেশ কয়েকটি চা বাগানের নিরক্ষর শ্রমিকদের এখনও ইংরেজিতে লিখা অভিযোগপত্র ও চিঠি প্রদান করা হচ্ছে। ফলে চা বাগানের লেখাপড়া না জানা শ্রমিকরা ভোগান্তি ও হয়রানির স্বীকার হচ্ছেন।

৭ ফুট বাই ১৪ ফুট ঘরে পুরো পরিবারের বাস, শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়েতো ভাবার সুযোগই নেই। উপরন্তু দ্রব্যমূল্য পাল্লা দিয়ে বাড়লেও তাঁদের বেতন সেভাবে বাড়ে না। এভাবে নানা বঞ্চনা নিয়ে দুর্দশার জীবন কাটাচ্ছেন বাংলাদেশের চা শ্রমিকরা।

উপসংহার :

পৃথিবীর সবচেয়ে নির্যাতিত শ্রেণি হলো শ্রমিক শ্রেণি। একবিংশ শতাব্দির শুরুতে দাঁড়িয়ে ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ সমাজ দর্শনে গোটা বিশ্ব আজ আতংকিত। ন্যায়-নীতি, আদর্শ, শ্রমিকের অধিকার সব কিছুই অনুপস্থিত। এমনি এক সময় জাতির জাগরণী কাফেলার অগ্রযাত্রায় শোষণ, নিপীড়ণ ও দুর্বিপাক মানুষকে উদ্ধার করার জন্য প্রয়োজন ইসলামী শ্রমনীতির বাস্তবায়ন। তবেই প্রতিষ্ঠিত স্থায়ী শান্তি, সুদৃঢ় হবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক আর শ্রমিক ফিরে পাবে তার ন্যায্য অধিকার। বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে হলে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করে মালিক-শ্রমিকের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। ইসলামী শ্রমনীতিতেই শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার সম্পর্কে যে নীতি অবলম্বন করেছে তাতে নেই কোনো অসঙ্গতি এবং নেই মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ।

লেখক: এমফিল গবেষক

আধুনিক গনতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার অধিকার আছে সবার। সংবিধানেও এর স্বীকৃতি আছে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতার ৫০ বছর অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু আজও চা শ্রমিকরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। সারা দেশের ১৬৬/১৬৭টি বাগানের মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে মাত্র ৬টিতে (মতান্তরে ১০/১৩ টিতে)। মাধ্যমিক স্কুল আছে মাত্র ৩ টিতে। শিক্ষার অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা এক অর্থে তাকে সমাজবিচ্যুত করে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়া। তার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে অধীনতায় ঠেলে দেয়া। বছরের পর বছর অবহেলা ও অপমানের বোঝা বৃহৎ এ জনগোষ্ঠীকে সভ্যতার আলো থেকেই বঞ্চিত করেনি, নিজেকে মানুষ ভাবার অধিকার থেকেও যেন বঞ্চিত করেছে। তাদের এই পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ শিক্ষার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা।

সংগঠন সংবাদ

কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের উদ্যোগে জেলা ও মহানগরীর দায়িত্বশীলাদের নিয়ে শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

গত ২৪ জুন বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের উদ্যোগে জেলা ও মহানগরীর দায়িত্বশীলাদের নিয়ে এক ভার্চুয়ালি শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদিকা ও মহিলা বিভাগের সেক্রেটারী রোজিনা আক্তারের পরিচালনায় উক্ত শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবক ডাঃ শফিকুর রহমান। শিক্ষা শিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো আলোচনা করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আ ন ম শামসুল ইসলাম, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় মহিলা উপদেষ্টা নুরুন্নিসা সিদ্দিকা, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান প্রমূখ। উক্ত শিক্ষা শিবিরে ফেডারেশনের মহিলা বিভাগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ সকল জেলা ও মহানগরী দায়িত্বশীলাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১১ জুন শুক্রবার বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে এক ভার্চুয়ালি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রমিক নেতা কবির আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ড. সৈয়দ সরোয়ার উদ্দিন সিদ্দিকীর পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিকুর রহমান।

উক্ত কর্মশালায় পরিবহন সেক্টরের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, জেলা ও মহানগরী নেতৃবৃন্দ এবং ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ অংশগ্রহন করেন।

কৃষি ও মৎস সেক্টরের দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৮ জুন শুক্রবার বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে কৃষি ও মৎস সেক্টরের দায়িত্বশীলদের নিয়ে ভার্চুয়ালি এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি শ্রমিক নেতা গোলাম রাব্বানীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হাসান রাজুর পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিকুর রহমান। উক্ত কর্মশালায় কৃষিজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দসহ সারা দেশের জেলা ও মহানগরী পর্যায়ের সকল দায়িত্বশীলবৃন্দ অংশগ্রহন করেন।

বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৪ জুন শুক্রবার বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে এক ভার্চুয়ালি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ মহিব্বুল্লাহর পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি মাওলানা আ ন ম শামসুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিকুর রহমান। কর্মশালায় বাংলাদেশ রিকশা শ্রমিক ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ সারাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অংশগ্রহন করেন।

দর্জি ও তাঁত সেক্টরের দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত

গত ৫ জুন বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের দর্জি ও তাঁত সেক্টরের দায়িত্বশীলদের নিয়ে ভার্চুয়ালি এক দায়িত্বশীল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এবং দর্জি ও তাঁত সেক্টরের সভাপতি এডভোকেট আলমগীর হোসাইনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল মতিনের পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। সমাবেশে সারা দেশের দর্জি ও তাঁত সেক্টরের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে রিকশা বিতরণ করছেন
ফেডারেশনের মহানগরীর প্রধান উপদেষ্টা মোঃ সেলিম উদ্দিন

ঢাকা মহানগরী উত্তরের রিকসা বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী উত্তরের উদ্যোগে আত্নকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে শ্রমিকদের মাঝে রিকসা বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের সভাপতি মহিব্বুল্লার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আতিকুর রহমানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে রিকশা বিতরণ করেন ফেডারেশনের মহানগরী উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা মোঃ সেলিম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর অন্যতম উপদেষ্টা আব্দুর রহমান মূসা। অন্যান্যদের মধ্যে অধ্যাপক ডাঃ খয়বর আলী,আব্দুর রশিদ, মোঃ বেলায়েত হোসেন, নূর মোহাম্মাদ রাসেলসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট সদর উপজেলার আয়োজিত ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য
রাখছেন সিলেট অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের

সিলেট সদর উপজেলার ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর সদর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম ফাহাদের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট অঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সিলেট অঞ্চল পরিচালক মাওলানা সোহেল আহমদ, সিলেট জেলা উত্তরের প্রধান উপদেষ্টা হাফিজ মাওলানা আনোয়ার হোসেন, সিলেট মহানগরী সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমেদ রাজু, সিলেট জেলা উত্তরের সভাপতি মাওলানা নিজাম উদ্দিন খাঁন, সাধারণ সম্পাদক জালাল আহমেদ চেয়ারম্যান, সদর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা সুলতান খাঁন, উপদেষ্টা সদস্য আব্দুল লতিফ লালা মেম্বার, নাজির উদ্দিন, সিলেট জেলা উত্তরের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সদর উপজেলার সাবেক ভাইস-চেয়ারম্যান মোঃ জৈন উদ্দিন। ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা উত্তর কৃষিজীবী ইউনিয়নের সভাপতি মাওলানা রুহুল আমীন, জেলা দাওয়া সম্পাদক মাওলানা নজরুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম সাদী, সাবেক ছাত্র নেতা আহমদ মাসুম, শ্রমিক নেতা রোটারিয়ান বেলাল আহমেদ, মোঃ তাজ উদ্দিন আহমেদ, শাহ লোকমান আহমেদ, হফিজুর রহমান বতু, দেলোয়ার হোসেন, গোলাম রাব্বানী প্রমূখ।

কুমিল্লা মহানগরীর ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বক্তব্য রাখছেন
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া

কুমিল্লা মহানগরীর ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমেদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মজিবুর রহমান ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহানগরীর উপদেষ্টা মাওলানা মাহবুবুর রহমান। অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মহানগরীর সহ-সভাপতি মোঃ শফিউল্লাহ, সহ-সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন, আব্দুল হাই শরিফ, নির্মান শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি নিজাম উদ্দিন, পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ রিপন, আদর্শ সদর পশ্চিমের সভাপতি মাওলানা মীর হোসাহন প্রমূখ।

সিলেট মহানগরীর ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফিজ আব্দুল হাই হারুন

সিলেট মহানগরীর ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ও মহানগরী সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমেদ রাজুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইয়াছিন খাঁনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি হাফিজ আব্দুল হাই হারুন। এসময় অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন আলমগীর, আব্বাস আলী, প্রচার সম্পাদক বদরুজ্জামান ফয়সাল, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল জলিল, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মিয়া মোহাম্মাদ রাসেল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা এটি এম খসরুজ্জামান, জাকারিয়া আহমেদ, আব্দুল বাছিত মিলন, রাশিদ আহমেদ চৌধুরী, আব্দুস সাত্তার মুন্না, আব্দুল বাছিত বাছন, আব্দুল বারী, আবু বকর প্রমূখ।

লক্ষিপুর জেলার রায়পুর উপজেলার ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির
বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

রায়পুর উপজেলার ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর উত্তর ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা সভাপতি মোঃ মহিউদ্দিন হারুনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মালেকের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের লক্ষীপুর জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী, রায়পুর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা সাইয়্যেদ নাজমুল হুদা, অন্যতম উপদেষ্টা আব্দুল আউয়াল রাসেল। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সহ- সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল বাশার, উপজেলা সহ-সভাপতি আব্দুল জলিল,সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইসমাইল, চর মোহনা ইউনিয়নের সভাপতি আবুল কালাম, চর পাতা ইউনিয়নের সভাপতি জহিরুল আলমসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

লক্ষীপুর শহর শাখার ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

লক্ষীপুর শহরের উদ্যোগে ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার লক্ষীপুর শহর শাখার উদ্যোগে সাধারণ শ্রমিকদের নিয়ে ঈদ পূর্ণর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের লক্ষীপুর শহর শাখার সভাপতি মোঃ মঞ্জুরুল আলম মিরনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান । বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী, ফেডারেশনের লক্ষীপুর শহরের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আবুল ফারাহ নিশান। আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক আবুল খাঁয়ের মিয়া, সহ- সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল বাশার, জেলা পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি জাকির হোসেন সবুজ,শহর শাখার সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন মহব্বত মেম্বারসহ কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ।

কক্সবাজার শহর শাখার ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর

কক্সবাজার শহর শাখার ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কক্সবাজার জেলার কক্সবাজার শহরের উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফেডারেশনের কক্সবাজার শহর শাখার সভাপতি মোঃ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কক্সবাজার জেলা সভাপতি শামসুল আলম বাহাদুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মহসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ইউ বাহাদুর। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক নেতা মোহাম্মাদ শাহজাহান, জসিম উদ্দিন, এম এ মাসুদ, মোহাম্মাদ কায়সার, মোঃ দিনার, মোহাম্মাদ আইয়াস প্রমুখ।

সিলেট মহানগরীর শাহপরান পশ্চিম থানার উদ্যোগে ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সিলেট মহানগরীর শাহপরান পশ্চিম থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের নিয়ে ঈদ পূণর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। শাহপরান পশ্চিম থানার সভাপতি ক্বারী আব্দুল বাসেত মিলনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহিবুর রহমান শামীমের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সিলেট মহানগরী সভাপতি এডভোকেট জামিল আহমেদ রাজু। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শাহপরান পশ্চিম থানার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ আনোয়ার আলী, ফেডারেশনের মহানগরীর সহ-সাধারণ সম্পাদক কফিল উদ্দিন আলমগীর, আক্কাস আলী, ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মিয়া মোহাম্মাদ রাসেল। উপস্থিত ছিলেন থানার সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ মোক্তার হোসেন,দফতর সম্পাদক আকতার হোসেনসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

সেবা মূলক কার্যক্রম

নারায়ণগঞ্জ জেলার ফ্রি চিকিৎসাসেবা উদ্বোধন করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান

নারায়নগঞ্জ জেলার ফ্রি চিকিৎসা সেবা প্রদান

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়নগঞ্জ জেলার উদ্যোগে শ্রমিকদের জন্য ফ্রী চিকিৎসা সেবা স্থানীয় জেলা কার্যালয়ে উদ্বোধন করা হয়। জেলা সভাপতি ড. আজগর ইবনে হযরত আলীর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে চিকিৎসা ক্যাম্প উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খাঁন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক এস এম শাহজাহান। এসময় জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ সহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষীপুর শহর শাখার উদ্যোগে সাধারণ শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

লক্ষীপুর শহর শাখার ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার লক্ষীপুর শহর শাখার উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের লক্ষীপুর শহর শাখার সভাপতি মোঃ মঞ্জুরুল আলম মিরনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের লক্ষীপুর জেলার অন্যতম উপদেষ্টা

এ আর হাফিজ উল্লাহ, জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা হুমায়ন কবির, সাধারণ সম্পাদক আবুল খাঁয়ের মিয়া, শহর শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক সালাহ উদ্দিনসহ শহর শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ কদমতলী থানা উত্তরের স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন সভাপতি হাফিজুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়সালের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম।

বরিশাল মহানগরীর ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন বরিশাল মহানগরীর উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ফেডারেশনের মহানগরী সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জাফর ইকবালের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও মহানগরী সভাপতি মাষ্টার মিজানুর রহমান। এসময় শ্রমিক নেতা মাহমুদ হাসান কামালসহ ফেডারেশনের মহানগরীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

শ্রমিকদের মাঝে রিকসা তুলে দিচ্ছেন ফেডারেশনের কুমিল্লা উত্তর জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আলী আশরাফ খান

কুমিল্লা উত্তর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে শ্রমিকদের মাঝে রিকসা, সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, কুমিল্লা উত্তর জেলার মুরাদনগর উপজেলার ধামঘর ইউনিয়নে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস উপলক্ষে মেহনতি শ্রমিকদের মাঝে রিকসা, সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়। জেলা সহ-সভাপতি ও উপজেলা সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক খানের সভাপতিত্বে শ্রমিক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের কুমিল্লা উত্তর জেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আলী আশরাফ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলার অন্যতম উপদেষ্টা অধ্যাপক মোঃ আলমগীর সরকার, জেলা সভাপতি অধ্যাপক মোঃ গিয়াস উদ্দিন, দেবিদ্বার উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম শহিদ, মুরাদনগর উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আ.ন.ম ইলিয়াস, মুরাদনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ইউসুফ হাকিম সোহেল, বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন আল্লামা হাবিবুর রহমান হেলালী, জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মোঃ মোশাররফ হোসাইন, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ অলিউল্লাহ, উপজেলা উপদেষ্টা মাওলানা মোঃ আমির হোসাইন, বিশিষ্ট শিল্পপতি মোঃ নজরুল ইসলাম, উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসিম উদ্দিন, উপজেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন সভাপতি মোঃ আবু হানিফ, পরিবহন শ্রমিক নেতা মোঃ খলিলুর রহমান প্রমুখ। উক্ত সমাবেশে মেহনতি শ্রমিকদের মাঝে রিকসা, সেলাই মেশিন ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।

সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভপুর উপজেলার ঈদ সামগ্রী বিতরণ

সুনামগঞ্জ জেলার ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভপুর উপজেলার উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপজেলা সভাপতি মোঃ হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা প্রধান উপদেষ্টা এডভোকেট আবুল বাসার। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলা কোষাধ্যক্ষ মোঃ জহিরুল ইসলাম, উপজেলা শ্রমিক নেতা ডাঃ উসমান গণী, শামসুল ইসলাম, ফেডারেশনের উপজেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ।

নোয়াখালী জেলার ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নোয়াখালী জেলার চৌমুহনী শহর শাখার উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। চৌমুহনী শহর শাখার সহ-সভাপতি মোঃ কবির হোসেনের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক রাজু উদ্দিনের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের চৌমুহনী শহর সভাপতি অলিউল্লাহ ইয়াসিন। এসময় ফেডারেশনের চৌমুহনী শহর শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ

স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন । এছাড়াও নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপজেলা সভাপতি মাওলানা মোঃ হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু ইউসুফের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ বেলায়েত হোসেন। এসময় ফেডারেশনের উপজেলা উপদেষ্টা মোশারফ হোসেনসহ উপজেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

ভোলা জেলার ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ভোলা জেলার চর ফ্যাশন পৌরসভার উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ভোলা পৌরসভার সভাপতি মোঃ শামছুদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইসমাইলের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মোঃ হারুনুর রশিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের পৌরসভার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যক্ষ মীর মোঃ শরীফ হোসেন। এসময় আরোও উপস্থিত ছিলেন চরফ্যাশন পৌরসভার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও ভোলা জেলার সদর উপজেলার উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপজেলা সভাপতি মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বশির আহমেদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা উপদেষ্টা মাষ্টার মোঃ বেলায়েত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইলিশা ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা ছালেহ উদ্দিন। এসময় উপজেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

রংপুর জেলা রিকসা-ভ্যান শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রিকসা-ভ্যান শ্রমিকদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপজেলা রিকসা-ভ্যান ইউনিয়নের সভাপতি মোঃ হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের উপজেলা সভাপতি আব্দুজ্জাহের নোমান। এসময় উপজেলা দোকান কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ইউনুছ আলীসহ উপজেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নীলফামারী জেলা ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নীলফামারী জেল্যার নীলফামারী শহর শাখার উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। নীলফামারী শহর শাখার সহ-সভাপতি মোঃ সুলতান মাহমুদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবু রায়হানের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের নীলফামারী শহর সভাপতি শফিকুল ইসলাম। এসময় ৯ নং ওয়ার্ডের সভাপতি মাওলানা আরিফ আল মামুনসহ নীলফামারী শহরের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মৌলভীবাজার জেলার ঈদ সামগ্রী বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপজেলা সভাপতি মোঃ আতাউর রহমান খাঁনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম খোঁকনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সাধারণ সম্পাদক আল-কাউসার রহমান। এসময় উপজেলা সহ-সভাপতি কাজী মাহমুদ আলীসহ ফেডারেশনের উপজেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

ঢাকা জেলা উত্তরের শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা জেলা উত্তর আশুলিয়া থানার উদ্যোগে শ্রমিকদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়। ঢাকা জেলা উত্তরের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও থানা সভাপতি ফাইজুল ইসলামের পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এবং ঢাকা উত্তর অঞ্চলের পরিচালক মোঃ মনসুর রহমান । উক্ত অনুষ্ঠানে ফেডারেশনের আশুলিয়া থানার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দসহ স্থানীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

নারায়ণগঞ্জ জেলার দায়িত্বশীলদের নিয়ে শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে দায়িত্বশীলদের নিয়ে শিক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও জেলা সভাপতি ড. আজগর ইবনে হযরত আলীর সভাপতিত্বে ও সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ শিকদারের পরিচালনায় উক্ত শিক্ষা শিবিরে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুস সালাম, জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি শ্রমিক নেতা শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির আলোচনা রাখছেন ফেডারেশনের
কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

লক্ষীপুর জেলার উপজেলা দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষীপুর জেলার উদ্যোগে উপজেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে শিক্ষা বৈঠক ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আবুল খায়ের মিয়ার পরিচালনায় উক্ত শিক্ষা বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা রাখেন জেলার অন্যতম উপদেষ্টা এ আর হফিজুল্লাহ, অন্যতম উপদেষ্টা মাওলানা সৈয়দ সরদার আহমদ। এসময় আরোও উপস্থিত ছিলেন ফেডারেশনের জেলা সহ-সভাপতি ও কমলনগর উপজেলার সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা হুমায়ন কবির, সহ-সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল বাশার, লক্ষিপুর শহর শাখার সভাপতি মোঃ মঞ্জুরুল আলম মিরন প্রমূখ।

রাঙ্গামাটি পৌরসভার কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন
কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান

রাঙ্গামাটি পৌরসভার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন রাঙ্গামাটি পৌরসভার উদ্যোগে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৌরসভার সভাপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ বেলাল উদ্দীনের পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক এস এম লুৎফর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের রাঙ্গামাটি জেলা সভাপতি আব্দুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ। সম্মেলনে পৌরসভার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

নাটোর জেলার ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের নিয়ে শ্রম আইন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন নাটোর জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে শ্রম আইন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও নাটোর জেলা সভাপতি ড. মোঃ জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফতাব উদ্দিনের পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন ফেডারেশনের নাটোর জেলার প্রধান উপদেষ্টা ড. মোঃ মীর নুরুল ইসলাম। এছাড়া উক্ত কর্মশালায় উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগন উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের
কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

ময়মনসিংহ মহানগরী ও জেলার যৌথ উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ময়মনসিংহ মহানগরী ও জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ময়মনসিংহ জেলা সভাপতি মাহবুবুর রশিদ ফরায়েজীর সভাপতিত্বে এবং ময়মনসিংহ মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক ওয়ালী উল্লাহ মুজাহিদের পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক নুরুল আমিন, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও ময়মনসিংহ মহানগরী সভাপতি আনোয়ার হাসান সুজন । এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা সাধারণ সম্পাদক আবুবকর সিদ্দীক মানিকসহ মহানগরী ও জেলার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। কর্মশালায় মহানগরী ও জেলার ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমেদ।

কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কুমিল্লা মহানগরীর উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক মহিউদ্দিন রিপনের পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য ও কুমিল্লা মহানগরী সভাপতি কাজী নজির আহমেদ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন দর্জি শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি এড. জিল্লুর রহমান, হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি মুহাম্মদ মাইন উদ্দিন সরকার, করাত কল ইউনিয়ন সভাপতি কলিম উল্লাহ, স্যানিটারী ট্রেড সভাপতি তোফায়েল আহমেদ,দোকান ট্রেডের সভাপতি আলমগীরসহ মহানগরীর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। কর্মশালায় মহানগরীর নিবন্ধিত সকল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন ফেডারেশনের লক্ষ্মীপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা এস ইউ এম রুহুল আমিন ভূঁইয়া

লক্ষ্মীপুর জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন লক্ষ্মীপুর জেলার উদ্যোগে ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীলদের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সাধারন সম্পাদক ও ট্রেড ইউনিয়ন সম্পাদক আবুল খায়ের মিঞার সভাপতিত্বে এবং সহ-সাধারন সম্পাদক মাওলানা আবুল বাশারের পরিচালনায় উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মীপুর জেলার প্রধান উপদেষ্টা এস ইউ এম রুহুল আমিন ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের জেলা সভাপতি মমিন উল্লাহ পাটোয়ারী। এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি মাওলানা হুমায়ন কবির , জেলা কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মঞ্জুরুল আলম মিরন, ডাঃ শামছুল হুদা, জাকির হোসেন সবুজ এবং আব্দুল হাকিম প্রমূখ। কর্মশালায় জেলার নিবন্ধিত সকল ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরগঞ্জ জেলার ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল সম্মেলনে প্রধান অতিথির আলোচনা রাখছেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান

কিশোরগঞ্জ জেলার ট্রেড ইউনিয়ন দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ১৮ জুন শুক্রবার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কিশোরগঞ্জ জেলার উদ্যোগে উপজেলা দায়িত্বশীল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের কিশোরগঞ্জ জেলা সভাপতি শ্রমিক নেতা খালেদ হাসান জুম্মনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম দুলালের পরিচালনায় উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও দফতর সম্পাদক নুরুল আমিন, জেলার অন্যতম উপদেষ্টা মাওলানা নাজমুল ইসলাম। উক্ত সম্মেলনে উপজেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ জেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সীগঞ্জ জেলার উদ্যোগ পরিবহন শ্রমিকদের নিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন মুন্সীগঞ্জ জেলার উদ্যোগ পরিবহন শ্রমিকদের নিয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় । মুন্সীগঞ্জ জেলা সভাপতি মোহাম্মদ খিজির আব্দুস ছালামের পরিচালনায় উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কবির আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন টংগীবাড়ী উপজেলার প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুল বারী, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন ঢাকা মহানগরী দক্ষিনের সহ-সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন চঞ্চল । সমাবেশে ড্রাইভার , কন্ট্রাকটর ও হেলপারসহ পরিবহনের বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমিকগন উপস্থিত ছিলেন

বিবৃতি

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে সর্বস্তরের শ্রমজীবী ভাই-বোনসহ দেশবাসীকে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের শুভেচ্ছা

সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ঐক্যের মেলবন্ধন পবিত্র ঈদুল ফিতর : বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান দেশে ও প্রবাসে অবস্থানরত সর্বস্তরের শ্রমজীবী ভাই-বোনসহ দেশবাসীকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। গত ১১ মে এক যৌথ বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, মাসব্যাপী সিয়াম সাধনা ও আত্ম সংযমের পালনের পর অপার খুশি ও আনন্দের বার্তা নিয়ে পবিত্র ঈদুল ফিতর আমাদের কাছে সমাগত। হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি ভুলে গিয়ে মানুষের মাঝে সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ঐক্যের আহ্বান নিয়ে আমাদের কাছে আসে পবিত্র ঈদুল ফিতর। নেতৃবৃন্দ বলেন, পবিত্র কুরআন নাজিলের মাস আমাদের নিকট থেকে বিদায় নিচ্ছে। রমজান মাস তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্তর সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার প্রশিক্ষণ দেয়। আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান মেনে চলার মধ্যে নিহিত রয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ। পৃথিবীব্যাপী চলা জুলুম-নির্যাতনের মূলোৎপাটন করতে হলে আল্লাহর বিধান কায়েমের বিকল্প নেই। এটিই একমাত্র সত্য ও সুন্দরের পথ। আমাদের সকলকে রমজানের প্রদত্ত শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আল্লাহর বিধান কায়েমের আন্দোলনকে বেগবান করতে হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রায় দুই বৎসর যাবত চলছে নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। করোনা ভাইরাসের নতুন নতুন ভ্যারিয়েশনে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ পযর্দুস্ত। তাই সর্তকর্তার অংশ হিসেবে আমাদের দেশেও একমাসের বেশী সময় ধরে লকডাউন চলছে। দেশের প্রায় সাড়ে ৭ কোটি মানুষ শ্রমজীবী। লকডাউনের কারণে কর্ম হারিয়ে অসহায় অবস্থায় দিনযাপন করছে এই সকল মানুষ। বিশেষত যারা দিন মজুর, দিনে এনে দিনে খায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। কর্মহীন মানুষগুলো পরিবার পরিজন নিয়ে নিদারুণ কষ্টে আছে। এই পরিবার গুলোতে নিত্য দিনের খাদ্য সামগ্রীর চরম সংকট চলছে। সন্তান-সন্ততিদেরকে ঈদের জন্য একটি নতুন জামা কিনে দিবে সেই সামর্থ্য আজ তাদের নেই। ঈদের আনন্দ থেকে এই সকল পরিবার যেন বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এই অসহায়-দুস্থ মানুষের সাহায্যার্থে সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার জন্য আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গার্মেন্টর্স সেক্টরসহ দেশের বিভিন্ন কল-কারখানায় অসংখ্য শ্রমজীবী ভাই-বোনেরা নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এই সকল শ্রমজীবী-দের এই কঠিন সময়ের শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট দাবী জানাচ্ছি। রমজানের শুরু থেকে আমরা বলে আসছি প্রতিটি শ্রমিকের বকেয়া বেতনসহ ঈদ উৎসবের ভাতা ২০ রমজানের পূর্বে পরিশোধ করতে। অনেক মালিক ভাইয়েরা ইতিমধ্যে পরিশোধ করেছেন। এখনো যারা পরিশোধ করেননি সেই মালিক ভাইদের প্রতি অনুরোধ পবিত্র ঈদুল ফিতরের পূর্বে শ্রমিকের বকেয়া বেতন ও বোনাস পরিশোধ করুন। নেতৃবৃন্দ বলেন, গতবারের ন্যায় এইবারও আমাদের ভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঈদুল ফিতর উদযাপন করতে হচ্ছে। ঈদুল ফিতরের আনন্দ উৎসব থেকে সমাজের একটি শ্রমজীবী পরিবার যেন বঞ্চিত না থাকে সে ব্যাপারে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যে সকল শ্রমজীবী কর্মহীন তাদের পরিবারের সাহায্যের জন্য আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে ঈদুল ফিতর মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নয়, সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ঐক্যের মেলবন্ধন গড়ে তুলে। সুতরাং নিরন্ন ও ঈদ বস্ত্রহীন মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসে তাদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে হবে। পরিশেষে নেতৃবৃন্দ, শ্রমজীবী মানুষসহ দেশবাসীর কল্যাণ, সুখ-শান্তি ও উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে আল্লাহ রাব্বুল নিকট দোয়া করেন। মহামারি নভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর সাহায্য চান। সর্বোপরি পবিত্র ঈদুল ফিতরের আনন্দ বার্তা নিয়ে প্রতিটি অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়নোর জন্য আবারো সমাজের বিত্তবানদের প্রতি বিনীত নিবেদন করেন।

জাতীয় সংসদে ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের প্রতিক্রিয়া

প্রস্তাবিত বাজেট শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে না - আ ন ম শামসুল ইসলাম

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য মহান জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেট প্রত্যাখান করে বলেছেন, এই বাজেট অতীতের ন্যায় গতানুগতিক বাজেট। প্রস্তাবিত বাজেটে হতদরিদ্র ও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাবে না। দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ ক্ষুদ্র শিল্পের সাথে জড়িত। এই সকল মানুষের জন্য বাজেটে নতুন কিছু রাখা হয়নি। অথচ করোনার এই মহামারীর সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো জন্য শ্রমিক বান্ধব বাজেট পেশ করা উচিত ছিল। জনাব শামসুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ইতিহাসের এটি সবচেয়ে বড় বাজেট পেশ করা হলেও এই বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে দেশের বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদরা মতামত দিয়েছেন। মূলত স্বজনপ্রীতি ও স্বজন তোষণের জন্য এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। যে সকল হতদরিদ্র, দিন আনে দিন খায় ও অনানুষ্ঠানিক খাতে যারা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে সে সকল শ্রমিকেরা বরাবরই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী বাজেট থেকে কোন প্রকার লাভবান হচ্ছে না। আমরা ভেবেছি সরকার বর্তমান পরিস্থিতি আমলে নিয়ে এই হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সরকার আবারও আমাদের একরাশ হতাশা প্রস্তাবিত বাজেটে উপহার দিয়েছে।

জনাব ইসলাম বলেন, দেশের এক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে অসহায় দরিদ্র মানুষদের দিনের পর দিন ঠকিয়ে আসা হচ্ছে। এইভাবে একটি দেশের অর্থনীতি চলতে পারে না। এ মুহূর্তে দেশের নিম্ন আয়ের মানুষকে বাঁচাতে তাদের জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মহীন

মানুষের জন্য কর্মসংস্থান করার পাশাপাশি কর্মহীনদের জন্য প্রণোদনা দিয়ে কর্মের সৃষ্টি করার জন্য বিশেষ বরাদ্ধ রাখা উচিত ছিল। কিন্তু একশ্রেণির মানুষের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী যেন দেশের হতদরিদ্র মানুষদের কথা ভুলে গিয়েছেন। ইতঃমধ্যে দেশের দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ এক শ্রেণীর মানুষের কুক্ষিগত হয়ে গিয়েছে। এই শ্রেণীর কাছে আজ দেশ ও জনগণ জিম্মি হয়ে পড়েছে। অর্থমন্ত্রী এই শ্রেণিধারা ভাঙতে কোন উদ্যোগ নেননি। ফলে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে গরিব থেকে আরও গরীব হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণায় উঠে এসেছে, দেশের তিন কোটির অধিক মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে গেছে। শামসুল ইসলাম বলেন, সরকার একের পর এক মেগা প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা বরাদ্ধ দিয়ে যাচ্ছে। দরিদ্র জনগণকে উপোস রেখে উন্নয়নের নামে এই সকল প্রকল্পে দুর্নীতির উৎসব চলছে। সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য যা বরাদ্ধ দিয়েছে তা ইতোমধ্যে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে। প্রায় ছয় কোটি দরিদ্র মানুষের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্ধ মাথাপিছু ১০০/২০০ টাকাও পড়বে না। করোনা ভাইরাসে দেশের স্বাস্থ্যখাত বিপর্যস্ত। দেশের সরকারি হাসপাতালগুলোতে মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীরাই চিকিৎসা সেবা নিয়ে থাকে। সেই স্বাস্থ্যখাতেও সবচেয়ে কম বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে। এখানে জিডিপির অন্তত ৩ শতাংশের ওপর বরাদ্ধ রাখা দরকার ছিল।

শামসুল ইসলাম বলেন, দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ক্রমশভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই ধারা রোধ করার জন্য কোনো পদক্ষেপ প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতিফলিত হয়নি। দেশের পোশাকসহ সকল শ্রমিকদের জন্য রেশন, বিনামূল্যে চিকিৎসা, স্বল্পমূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা রাখা এই মুহুর্তের জন্য জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সরকার এত বড় বাজেট দিলেও দেশের অর্থনীতির চাকা যারা সচল রাখছে তাদের জীবনমান উন্নয়নের কোন চেষ্টা করছে না। যা সত্যিই দুঃখজনক।

তিনি বলেন, সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল, চিনিকল, বস্ত্রকল গুলো ধারাবাহিকভাবে বন্ধ করে দিয়ে অসংখ্য শ্রমিককে কর্মহীন করে রাখছে। এই সকল শ্রমিকদের শতশত কোটি টাকা বছরের পর বছর বকেয়া রয়ে গেছে। যা এই বাজেটেও পরিশোধের কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ফলে যেকোন সময় শ্রমিকরা ধৈর্যহারা হয়ে আবারও বকেয়াা আদায়ের জন্য রাজপথে নেমে আসতে পারে। দেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধ করার জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরীর বিকল্প নেই। কিন্তু দক্ষ জনশক্তি তৈরীর করার জন্য সরকার কোন বরাদ্ধ রাখেনি।

তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনায় করতে গিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। মোট বাজেটের এক তৃতীয়াংশের বেশী ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। যা বৈদেশিক কিংবা আভ্যন্তরীন সোর্স থেকে ঋণ নিয়ে পূরণ করতে হবে। বর্তমান সরকার জনগণের সরকার নয়। তাই জনগণের স্বার্থ বাদ দিয়ে এক শ্রেণীর মানুষের তাবেদারী করে যাচ্ছে। জনগণের কাছে জবাবদিহির অনুভূতি না থাকায় ক্ষমতাসীনরা নিজেদের পকেট ভারীর করার কাজে বেশী মত্ত। আমরা বাংলাদেশের মেহনতি শ্রমিক সমাজের পক্ষ থেকে ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট প্রত্যাখান করলাম। জনাব শামসুল ইসলাম সরকারকে উদ্দেশ্য করে বলেন, অবিলম্বে এই বাজেট জাতীয় সংসদ থেকে প্রত্যাহার করুন। পুনরায় দেশের মানুষ কথা চিন্তা, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করে শ্রমিক বান্ধব বাজেট পেশ করুন। দেশের শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন না হলে কোন উন্নয়ন দেশের কাজে আসবে না। দল-মত নির্বিশেষে বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের নিয়ে নতুন বাজেট প্রণয়ন করুন। অন্যথায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও জীবন জীবিকা রক্ষার জন্য আমরা শ্রমজীবী মানুষদের সাথে নিয়ে আগামী দিনে রাজপথে নেমে আসতে বাধ্য হবো।

সারাদেশে ব্যাটারী চালিত রিকশা-ভ্যান বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

শ্রমজীবী মানুষের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ব্যাটারী চালিত রিকশা-ভ্যান বন্ধ করা যাবে না -শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান গত ২৫ জুন শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে সারাদেশে ব্যাটারী চালিত রিকশা-ভ্যান বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, করোনাকালীন দুর্যোগে যখন নিম্ন আয়ের শ্রমিকেরা কর্ম হারিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনানিপাত করছে। তখন সরকার এই সকল শ্রমজীবী মানুষের মুখে দুবেলা দুমুঠো ভাত তুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। নিজেদের জীবন-জীবিকা নির্বাহের জন্য অসংখ্য শ্রমিক ব্যাটারী চালিত রিকশা-ভ্যানকে বেছে নিয়েছে। ঠিক এই সময়ে এসে হুট করে ব্যাটারী চালিত রিকশা-ভ্যান বন্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত চরম আত্মঘাতি। সরকারের এই অমানবিক ও অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের রুটি-রোজগার বন্ধ করে দিবে। সুতরাং শ্রমজীবী মানুষের বিকল্প আয়ের ব্যবেস্থা না হওয়া পর্যন্ত ব্যাটারী চালিত রিকশা-ভ্যান বন্ধ করা যাবে না। নেতৃবৃন্দ বলেন, সারাদেশে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক শ্রমিকের আয়ের উৎস ব্যাটারী চালিত রিকশা-ভ্যান। একেক জন শ্রমিক একেকটি পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে। কোন ধরনের চিন্তা ভাবনা ছাড়া হঠাৎ করে ব্যাটারি চালিত রিকশা-ভ্যান বন্ধের সরকারি ঘোষণা এই ১৫ লক্ষ পরিবারকে দুর্ভোগে নিপতিত করবে। এতগুলো মানুষের রুটি-রুজি একদিনের সিদ্ধান্তে বন্ধ করা চরম অমানবিক এবং তা কোনভাবে কাম্য নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার আলোকে ধারাবাহিকভাবে ব্যাটারী চালিত রিকশা ভ্যান শ্রমিকদের অন্য সেক্টরে নিয়োজিত করে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, অবিলম্বে সরকারকে ব্যাটারী চালিত রিকশা-ভ্যান বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে। শ্রমিকের দুর্ভোগ কমাতে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করার করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে রূপান্তরের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ঠ যেকোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করতে হবে।

শোকবাণী

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সাবেক সচিব শাহ আবদুল হান্নানের ইন্তিকালে শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের গভীর শোক প্রকাশ

শাহ আবদুল হান্নান আদর্শ, ন্যায়-নীতি ও সততার প্রতিক : শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব শাহ আব্দুল হান্নানের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। গত ২ জুন বুধবার এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুম শাহ আব্দুল হান্নানের দেশ ও জাতির প্রতি অবদানের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন। নেতৃবৃন্দ বলেন, জনাব শাহ আবদুল হান্নান ছিলেন একজন ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, লেখক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজসেবক। বহুগুণে গুণান্বিত শাহ আবদুল হান্নান বাংলাদেশ সরকারের একজন আমলা হিসেবে কর্মজীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা, সততা ও ন্যায়-নীতির প্রতীক ছিলেন। তার আদর্শিক কর্মের মাধ্যমে সর্বমহলে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। শাহ আবদুল হান্নান বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের বিভিন্ন সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গর্ভনর, দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মহাপরিচালক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাকিং বিভাগ, সমাজ কল্যাণ ও সর্বশেষ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগের সচিব ছিলেন। রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান থাকাকালীন ভ্যাট চালুর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। তিনি সমাজ সংস্কার ও শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। দারুল ইহসান ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি ইসলামী অর্থনীতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান, ইবনে সিনা ট্রাষ্ট ও দিগন্ত মিডিয়া কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, শাহ আবদুল হান্নান খুবই সাদাসিধে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। অমায়িক ব্যবহারের পাশাপাশি তার ক্ষুরধার লেখনি দিয়ে সম-সাময়িক বিষয় ও ইসলামী আদর্শ জাতির সামনে আমৃত্যু তুলে ধরেছেন। তার মত আদর্শিক ব্যক্তির শূণ্যতা সহজে পূরণ হওয়ার নয়।

উল্লেখ্য মরহুম শাহ আবদুল হান্নান ২ জুন সকাল ১০ টা ৩৭ মিনিটে রাজধানীর একটি বেসকারি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ১ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের প্রথম জানাযা ধানমন্ডি ইদগাহে ও দ্বিতীয় জানাযা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকারমে অনুষ্ঠিত হয়। দুটি জানাযা শেষে মরহুমকে শাহাজাহানপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

টাঙ্গাইল জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতির পিতার ইন্তেকালে নেতৃবৃন্দের গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভাপতি শফিকুল ইসলামের সম্মানিত পিতা জনাব আব্দুর রশিদ খানের এর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। গত ১২ জুন শনিবার এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুম আব্দুর রশিদের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন। উল্লেখ্য মরহুম আব্দুর রশিদ খান গত ১ জুন রাত ৯ ঘটিকায় নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ৩ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা ২ জুন বাদ যোহর টাঙ্গাইল জেলার বাসাইল উপজেলার কাঞ্চনপুর দক্ষিণপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

প্রবীণ শ্রমিক নেতা অধ্যক্ষ সোলাইমান মৃধার ইন্তেকালে নেতৃবৃন্দের গভীর শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের নরসিংদী জেলা শাখার সহ-সভাপতি ও প্রবীণ শ্রমিক নেতা অধ্যক্ষ মাওলানা সোলাইমান মৃধার (৭০) ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাবেক এমপি আ ন ম শামসুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান। গত ১৩ জুন রবিবার এক যৌথ শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ ইসলামী শ্রম আন্দোলনে মরহুম অধ্যক্ষ সোলাইমান মৃধার অবদানের কথা স্মরণ করে এ শোক প্রকাশ করেন। শোকবার্তায় নেতৃবৃন্দ মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। নেতৃবৃন্দ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মরহুমের নেক আমল সমূহ কবুল করে তাকে জান্নাতবাসী ও আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ধরার শক্তি দান করার জন্য দোয়া করেন। উল্লেখ্য মরহুম অধ্যক্ষ সোলাইমান মৃধা গত ১৩ জুন রবিবার দুপুর ১২ ঘটিকায় নিজ বাড়ীতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে ও ২ মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযা ১৩ জুন রাত ৮ ঘটিকায় নরসিংদী জেলার রায়পুরার বালুয়াকান্দি শামসুল উলুম মাদরাসা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে মরহুমকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

ইসলামী বইয়ের বিশাল সমাহার
৩০% কমিশনে সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে

ক্রম	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	ইসলাম ও শ্রমিক আন্দোলন	ড. জামাল আল বান্না	১০০/-
২	যিকির ও দোয়া	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৩	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শিরক ও বেদায়াত	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৩০/-
৪	ইসলামী আন্দোলনে শ্রমজীবি মানুষের গুরুত্ব ও ইউনিয়ন গঠন পদ্ধতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৫	ইসলামী শ্রমনীতি	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	৪০/-
৬	ইসলামী সমাজে শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	২০/-
৭	ঐতিহাসিক ভাষন	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১০/-
৮	হাদীসের আলোকে মালিক-শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব	অধ্যাপক হারুনুর রশিদ খান	১৫/-
৯	শ্রমিক সমস্যার সমাধান	অধ্যাপক গোলাম আজম	১৫/-
১০	শ্রমিক আন্দোলন ও মাওলানা মওদুদী	সাইয়েদ মাওলানা মওদুদী	১৫/-
১১	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬	মো: আশরাফুল হক	১৩০/-
১২	ট্রেড ইউনিয়ন গাইড লাইন	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	৪০/-
১৩	ইসলামী শ্রমনীতির সুফল	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১৫/
১৪	ট্রেড ইউনিয়ন কাজের পদ্ধতি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন	১০/-
১৫	তৃণমূল পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও ইসলামী আন্দোলন	কবির আহমদ মজুমদার	২৫/-
১৬	শ্রম আইন ও শ্রমিক কল্যাণ	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/-
১৭	আল কুরআনের পাতায় শ্রম শ্রমিক শিল্প	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
১৮	মহিলা শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১২/-
১৯	শ্রমিকের অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২০	শিশু অধিকার	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১০/
২১	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কি ও কেন	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	৭/-
২২	Introduction to (BSKF)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	২০/-
২৩	Islam & Rights of Labours	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	১৫/-
২৪	ইসলামী আন্দোলনে মহিলা কর্মীর দায়িত্ব ও কর্তব্য	বেগম রোকেয়া আনছার	২২/-

কল্যাণ প্রকাশনী

৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।
যোগাযোগ : ০১৮৭৬৯৯০১৮৬, ০১৯৯২৯৫১৩৬৪

অবিস্মরণীয় সাফল্যগাঁথা
মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষা ২০২০-২১
২য়
তানভীন
১ম
মুনমুন
৪র্থ
রাকিবুল
প্রথম ১০ এ ৮ জন
ডিএমসি তে ১৫৫ জন সহ
সর্বমোট চান্সপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী ৩১০৩+ জন
রেটিনা